নারদীয় ভক্তিসূত্র

স্বামী প্রভবানন্দ

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর—১৯৬১

প্রচ্ছদ শিল্পী
গণেশ বসু

মুদ্রক
রবীন্দ্র প্রেস
১২, যতীন্দ্র মোহন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	... ...	॥৶০
ভূমিকা—ক্রিষ্টোফার ঈশারউড	... ..	৸০
নারদ	... ..	১
প্রথম পরিচ্ছেদ :	পরাভক্তির সংজ্ঞা ..	৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	ত্যাগ ও শরণাগতি .	৩৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	ভক্তির লক্ষণ ...	৫০
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	মানবজীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য .	৬৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ :	পরাভক্তি লাভের উপায় .	৭৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :	সৎসঙ্গ ও প্রার্থনা ..	৯৮
সপ্তম পরিচ্ছেদ :	প্রাথমিক ও পরাভক্তি ..	১২০
অষ্টম পরিচ্ছেদ :	ভগবৎপ্রেমের রূপ .	১২৮
নবম পরিচ্ছেদ :	নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎপূজা	১৪৫

ভূমিকা

নারদ বলছেন, "ভক্তিপথই ভগবান্‌লাভের সহজতম পথ।"

ভক্তিপথ বা ভক্তিযোগ হ'ল ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান্‌লাভেব পথ। ভগবান্‌কে ভালবাসার জন্য এবং তাঁর ভালবাসা উপলব্ধি করার জন্য ভক্ত সজাগ হ'য়ে নিরন্তর চেষ্টা করে; ভগবানেব নামজপ এবং আনুষ্ঠানিক পূজাদি তার সাধনা। ঈশ্বরের কোন বিশেষ রূপকে বা অবতারগণের মধ্যে কোন একজনকে বিশেষ উপাস্যরূপে (ইষ্টরূপে) বরণ ক'রে সে তাঁতে মনোনিবেশ করে। অন্যান্য আচার্যগণের মতোই নারদ জোর দিয়ে বলছেন, ভক্তি যত বৃদ্ধি পাবে ভক্ত তত বেশী ক'রে অনুভব করবে যে, তার উপাস্য তার অন্তরেই রয়েছেন, তিনিই তার স্বরূপ: ভক্তির চরম অবস্থায় উপলব্ধ হবে, উপাসক ও উপাস্য অভেদ।

হিন্দুদর্শন মতে ভগবানের সঙ্গে নিজের এই একত্বানুভূতির পথ চারটি —ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। কর্মযোগ হ'ল নিঃস্বার্থ কর্মেব—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হ'য়ে, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থেকে কৃত কর্মের পথ; মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করা এ পথের সাধনরূপে প্রায়শঃ গৃহীত হয়। জ্ঞানযোগ হ'ল সদসদ্-বিচারের মাধ্যমে ভগবান্‌লাভের পথ; চূড়ান্ত বিশ্লেষণের ফলে যখন জাগতিক সব কিছু অসৎ, অনিত্য ব'লে পরিত্যক্ত হয়, তখন (সদ্বস্তু বলতে) থাকেন একমাত্র ভগবান্; এবং এই 'নেতি-নেতি' ক'রে বিচারের দ্বারাই তিনি উপলব্ধ হন। রাজযোগ হ'ল গভীর ধ্যানের মাধ্যমে ভগবান্‌লাভের পথ।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ তিনটি পথে চলতে গেলে যে-সব গুণ ও যে শক্তির প্রয়োজন, তা প্রত্যেকের, এমনকি অধিকাংশ লোকেরই নেই। কর্মের পথে বীরোচিত শক্তি এবং সেইসঙ্গে অত্যধিক নম্রতা ও ধৈর্যের প্রয়োজন; জ্ঞানপথে চলতে গেলে চাই অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; রাজযোগে

চাই অচঞ্চল একাগ্রতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম। দেখা যায়, এ সবের তুলনায় ভক্তিযোগের সাধনা অনেক সহজ, কম কঠোর এবং অধিকতর আকর্ষণীয়। তাছাড়া, অসাধারণ শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও একাগ্রচিত্ততার অধিকারী ব'লে গর্ব করতে না পারলেও আমাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা ভালবাসতে পারি। কাজেই যোগগুলির মধ্যে ভক্তিযোগই সহজতম—একথা আমরা শোনামাত্রই মেনে নিই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মেনে নেওয়াটা একটু বেশী তাড়াতাড়িই হ'য়ে যায়। কারণ, আমরা বেশীরভাগ লোকই কি ঠিকমতো বুঝি, কি বরণ করছি? ভগবৎ-প্রেম বলতে নারদ কি বোঝাতে চাচ্ছেন সে সম্বন্ধে আমাদের আদৌ কোন ধারণা আছে কি? আমরা যখন ভালবাসা বা প্রেম শব্দটি ব্যবহার বা অপব্যবহার করি তখন নিজেরাই কী বোঝাতে চাই তা কখনো তলিয়ে ভেবেছি কি? বস্তুতঃ, আমরা কখনো কি কাউকে ঠিক ঠিক ভালবেসেছি?

"To be in love with love" (ভালবাসার প্রেমে পড়া)—এই বাক্যটি (ইংরেজী ভাষায়) এক সময় দৈনন্দিন কথাবার্তায় খুবই প্রচলিত ছিল, সঙ্গীত-রচয়িতাদের খুবই প্রিয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্কেরা তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের হৃদয়াবেগ সম্বন্ধে আলোচনাকালে একটু মুরুব্বির হাসি ফুটিয়ে বলতেন, "ও ভালবাসার প্রেমে পড়েছে—ও কিছু নয়।" অর্থাৎ আলোচ্য অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েটি সত্যিই প্রেমে পড়েনি, আবেগময় আত্ম-প্রবঞ্চনাকে একটু প্রশ্রয় দিচ্ছে মাত্র। কোন অভিজ্ঞ যোদ্ধা যখন কোন শিক্ষানবীস সৈনিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে তখন তার কথার সুরে যেমন একটা ভয়ানক তৃপ্তির ইঙ্গিত থাকে, ঠিক সেই ইঙ্গিতই প্রাপ্তবয়স্কদের কথার সুরে থাকতো: যথার্থ ভালবাসা কি বস্তু, তা ওরা পরে বুঝবে—সে ভালবাসা হ'ল পরিণত, গাম্ভীর্যময় এবং বাস্তবস্পর্শী।

পূর্বোক্ত বাক্যটি এখন আর প্রচলিত নয়, কিন্তু মনোভাবটি রয়ে

গেছে ; ভালবাসা প্রকৃত কি না, তা এখনো নির্ধারিত হয় সে-ভালবাসা কী পরিণাম ও দায়িত্ব আনল তা দেখে—সামাজিক স্বীকৃতি না অপমান, বিবাহ না বিচ্ছেদ, সম্পদ্ না ঋণ, সন্তানপালন না নিঃসন্তানতা, গার্হস্থ্য জীবনের দাসত্ব না তা থেকে মুক্ত থাকা? লোকে ভালবাসার কথা আলোচনা করছে ব'লে যখন মনে হয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসলে তখন আলোচিত হয় ভালবাসার ফলাফলের কথা ; সত্যি বলতে কি, কখনো কখনো এই ফলাফলগুলির জন্য ভালবাসাকে চিনে ওঠাই দায় হয়। সাধারণতঃ যা আলোচিত হয় তা অবশ্য যৌনসম্পর্ক। কিন্তু একথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, মা-বাপ ও সন্তানদের মধ্যে, বন্ধুদের মধ্যে, সহকর্মীদের মধ্যে, এমনকি পালিত পশু ও তার প্রভুর মধ্যেও যে (ভালবাসার) সম্পর্ক, তা-ও সঙ্কটকালে সমভাবে তিক্ত হ'য়ে উঠতে পারে, অনুরূপ সামাজিক ও আর্থিক অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, ঈর্ষাজনিত এবং বিরুদ্ধ অহমিকার নির্দয় সংঘর্ষজনিত অনুরূপ যন্ত্রণার ঝড় তুলতে পারে?

এমন লোক নিশ্চয়ই অনেক আছেন যাঁরা তাঁদের অহমিকার বাঁধনকে যে-ভাবেই হোক প্রয়োজনমতো একটু আলগা করে দিতে পারেন, যাতে মোটামুটি নিঃস্বার্থভাবে পরস্পরকে আজীবন ভালবাসতে পারা যায়। এমনকি, সর্বাধিক অসুখী সম্পর্কের মধ্যেও কিছুটা ভালবাসা বা যা-হোক একটু ভালবাসার স্মৃতি সবসময়ই থাকে। আর, নারদ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, অহমিকার দ্বারা যত বিকৃত বা সীমিতই হোক না কেন, সব ভালবাসাই মূলতঃ ঈশ্বরীয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই ধরণের অসম্পূর্ণ মানবিক ভালবাসার ধারণা কি ভক্তিযোগ সম্বন্ধে ধারণা করতে আমাদের কোন সহায়তা করতে পারবে?

নারদবর্ণিত যে ভালবাসা, তাতে কোন ঈর্ষা, কোন অহমিকার দ্বন্দ্ব, কোন পার্থিব সুবিধালাভ বা একচেটে অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে না ; এ ভালবাসায় নিরানন্দের কোন স্থান নেই। এমনকি, ভগবান

সহিত সাময়িক বিচ্ছেদজনিত যন্ত্রণাকেও নিরানন্দ বলা যায় না ; যে ভক্ত সে-বিচ্ছেদ অনুভব করে, একে বিচ্ছেদ ব'লে বোঝে বলেই সে উপলব্ধি করে যে, ভগবান আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রাণবন্ত ও বাস্তব।

কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের শিক্ষানবীস অবস্থায় আমরা এই দুঃখহীন প্রেমতত্ত্ব ধারণাই করতে পারি না, বলা চলে। আমরা মনে মনে ভাবি, একে ভালবাসাই বলা চলে না—এ ভালবাসা তো নিরুত্তাপ, অস্বাভাবিক ও অমানবিক। কারণ, অকপট হ'লে আমাদের স্বীকার করতেই হয়, জাগতিক ভালবাসার দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের এত সর্তাবদ্ধ ক'রে ফেলেছে যে ভালবাসতে হ'লে সত্যিসত্যিই আমাদের ঈর্ষাপরায়ণ হতে হবে, লালসা ও উদ্বেগের যন্ত্রণায় ভুগতে হবে, অসম্ভব একচেটে অধিকারের জন্য দাবী জানাতে হবে ; কারণ এইসব পরিচিত যন্ত্রণা থেকে সাময়িক মুক্তিকেই আমরা ভালবাসার সুখ বলি—এসব যন্ত্রণা না থাকলে তা উপভোগই করতে পারি না।

কাজেই 'ভালবাসার সঙ্গে প্রেমে পড়া'—এই আপাত-অর্থহীন পুরনো বাক্যটির এখনো কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে ; ভক্তি বলতে কি বোঝায়, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক আভাস দিতে বাক্যটি বোধ হয় সহায়ক হ'তে পারে। দুটি ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্করূপে ভালবাসার কথা চিন্তা করা বন্ধ রেখে, আসুন, আমাদের প্রত্যেকের ভেতর ভালবাসার শক্তি কতখানি আছে, সে বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক। সে শক্তি হয়তো খুব কম হ'তে পারে, কিন্তু তা আমাদের নিজস্ব এবং তা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। আমরা সবাই একমত হ'তে পারি যে, আমাদের ভালবাসা এভাবে যখন বাইরের কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে বিবেচিত হয়, তখন সে-ভালবাসাই ভালবাসার যোগ্য এবং সম্পূর্ণরূপে কামনা ও যন্ত্রণা-মুক্ত হ'য়ে ওঠে। প্রেমই ভগবান—এই ভাবটিকে এভাবে আমরা ধারণায় আনা শুরু করতে পারি।

ক্রিস্টোফার ঈশারউড

নারদ

ভক্তিসূত্রের প্রণেতা নারদ। কিন্তু নারদ কে ছিলেন, বলা বড় কঠিন। পৃথিবীর প্রাচীন শাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে আমরা দেখি, তিনি অধ্যাত্মজ্ঞানপিপাসু হয়ে মহর্ষি সনৎকুমারের নিকট যাচ্ছেন। ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নারদ কলা, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, দর্শন এবং প্রাচীন শাস্ত্রাদির সকল বিভাগেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি সনৎকুমারকে বললেন, "আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমি সব পড়েছি, কিন্তু আত্মাকে জানি না। আমি আপনার মতো মহান্ আচার্যদের কাছে শুনেছি, যে আত্মাকে জানে সেই কেবল দুঃখকে অতিক্রম করতে পারে। আমার কপালে চিরদুঃখ। এই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমাকে দয়া ক'রে সাহায্য করুন।"

এভাবে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অনেক আলোচনার পর সনৎকুমার নারদকে বললেন, "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" ভূমাতেই সুখ; অল্পেতে সুখ নেই। যা অসীম, তা অমরণধর্মী; সসীম বস্তু মরণশীল। যিনি পরমাত্মাকে—সেই সীমাহীন সত্তাকে জানেন, তাঁকে ধ্যান করেন এবং উপলব্ধি করেন, তিনি আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই মিলন-সুখ অনুভব করেন এবং আত্মানন্দে মশগুল হয়ে যান, তিনি তখন নিজের ও জগতের প্রভু হন। যারা এই সত্য জানে না, তারা ক্রীতদাস-স্বরূপ।

"ইন্দ্রিয়গণ পবিত্র হ'লে [অর্থাৎ আসক্তি ও তৃষ্ণা-বর্জিত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের ভিতর বিচরণ করলে] হৃদয় পবিত্র হয়; হৃদয় পবিত্র হ'লে নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মার স্মরণ-মনন হয়; এবং এরূপ ধ্রুবা স্মৃতি লাভের ফলে সকল বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, সাধক মুক্ত হয়।"

এরপর আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে নারদের উল্লেখ পাই। সেখানে তিনি একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ হয়েছেন। নারদ ব্যাসকে (যিনি বেদের সংকলক ও মহাভারতের রচয়িতা) শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করবার জন্য অনুরোধ করেন। এইসূত্রে নারদ ব্যাসকে তাঁর জন্মের ইতিহাস বলেন—এক জন্মের নয়, দুই জন্মের ইতিহাস—

"আমার গত জন্মের কথা এবং কি ভাবে আমি স্বর্গীয় শান্তি ও মুক্তির অধিকারী হয়েছি—তা বলছি। ঋষিদের তপোবনে আমার মা ছিলেন দাসী। তাঁদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আমি লালিত-পালিত হয়েছি এবং তাঁদের সেবা করেছি। সেই পবিত্র সৎসঙ্গে থেকে আমার হৃদয় পবিত্র হয়েছে।"

মহাপুরুষের কৃপা ও দেবমানবগণের সংসর্গই ভগবৎপ্রেম ও ভগবান্ লাভের উপায়। আধুনিক যুগের প্রখ্যাত মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত একজন মহাপুরুষের শরণাগত হও; তিনি কৃপাপূর্বক যথাসময়ে তোমাকে মুক্ত করবেন। ভগবানের শরণাগত হওয়া আরও ভাল, কিন্তু বড় কঠিন। শতাব্দীকালের মধ্যে হয়তো একজনকে পাওয়া যায়, যিনি প্রকৃতই ঐরূপ শরণ নিয়েছেন। যাহোক, সাধক যদি ভগবানের জন্য ঐকান্তিকভাবে ব্যাকুল হন, তবে তিনি তাঁর গুরুর দেখা পাবেন। ভগবৎপ্রেমিকদের উপস্থিতিতেই স্থান পবিত্র হয়। ঈশ্বরের সন্তানদের এরূপই মহিমা। যাঁরা ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেছেন, তাঁদের মুখনিঃসৃত বাণীই শাস্ত্র। তাঁরা যেখানে অবস্থান করেন, সেই স্থান আধ্যাত্মিক স্পন্দনে স্পন্দিত হয়। যাঁরা সেই স্থানে আসেন, তাঁরাও সেই স্পন্দন অনুভব করেন ও পবিত্র হন।

নারদ বলতে লাগলেন: "সৎসঙ্গে থেকে আমার হৃদয় পবিত্র হ'ল। একদিন এক মুনি আমার প্রতি গভীর ভালবাসার দরুন আমাকে জ্ঞান-লাভের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত হ'ল

এবং আমি আমার দৈবী সত্তা অনুভব করলাম। তখন আমি এই শিক্ষা পেলাম যে—দৈহিক ও মানসিক, এক কথায় জীবনের সর্বপ্রকার অশুভের প্রতিবিধান হ'ল ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ। কর্মই আমাদের বন্ধন আনে এবং ভগবানে কর্ম সমর্পণের দ্বারা আসে মুক্তি। ভগবৎসেবা-রূপ কর্ম দ্বারা আমরা প্রেম ও ভক্তি লাভ করি। এই প্রেম ও ভক্তি ক্রমশঃ জ্ঞানে পর্যবসিত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয়ে আমরা প্রেমময় ভগবানের শরণাগত হই ও তাঁকে ধ্যান করি। এরূপে আমি জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করেছি।"

উপরি-উক্ত কথাগুলিতে আমরা সকল যোগের সমন্বয় দেখতে পাই। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, বিচারের দ্বারা ও ধ্যানের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে সংযোগ। বায়ুরুদ্ধ কক্ষের ন্যায় এই যোগ-চতুষ্টয় পরস্পর পৃথক্ নয়। যদি কোন মানুষ ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে যে-কোন একটি যোগের অনুসরণ করেন, তবে বাকীগুলি তাঁর জীবনে এসে মিশবে।

নারদ বলতে লাগলেন, "আমার মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত আমি ঐ মহাত্মাদের সঙ্গে বাস করলাম। তারপর তপোবন ছেড়ে দেশ-দেশান্তরে বেড়াতে শুরু করলাম। অবশেষে নির্জনতার অন্বেষণে এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি। সেই শান্ত নির্জন পরিবেশে এক বৃক্ষতলে বসে জগৎ ভুলে প্রেমময় ভগবানের ধ্যান শুরু করি। ক্রমশঃ আমার অন্তর্দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'ল। আমি দেখলাম, আমার হৃদয়কন্দরে সেই দয়াময় প্রেমময় ঈশ্বর বিরাজিত। আমি এক অব্যক্ত আনন্দে অভিভূত হলাম; ভগবানকে নিজ থেকে আর পৃথক-রূপে ভাবতে পারলাম না। আমি তাঁর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করলাম। কিন্তু ঐ দিব্যভাবে বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। আবার এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নেমে এলাম। কিন্তু হায়! আবার ঐ দিব্য-ভূমিতে পৌঁছাতে আমি আন্তরিক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তখন ওটি অসম্ভব ব'লে মনে হ'ল।

"তারপর আমি একটা দৈববাণী শুনলাম। আমাকে সান্ত্বনা দেবার ছলে ভগবান্ বলছেন, 'বৎস, এ জীবনে তুমি আর আমার দেখা পাবে না। বাসনার নিবৃত্তি না হ'লে কেউ আমার দেখা পায় না। কিন্তু, আমার প্রতি তোমার ভক্তি থাকায় আমি তোমাকে একবার মাত্র ঐ দিব্যদর্শন দিয়েছি। যে-সকল ঋষি আমার ভক্ত তাঁরা ক্রমশঃ সকল বাসনা ত্যাগ করেন। সাধুসঙ্গ কর, তাঁদের সেবা কর, এবং আমাতে দৃঢ়ভাবে মনো-নিবেশ কর। এরূপে কালে তুমি আমার সঙ্গে তাদাত্ম্য অনুভব করবে। তখন আর বিচ্ছেদ ঘটবে না এবং মৃত্যুও হবে না।

"যথাসময়ে আমি দেহ ত্যাগ ক'রে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হলাম। সেই মহিমান্বিত সাযুজ্য অবস্থায় আমি এক কল্পকাল বাস করলাম। পরবর্তী কল্পারম্ভে আমি এই জগতে প্রেরিত হলাম। এখানে আমি পবিত্র সংযত জীবন যাপন করছি। ভগবৎকৃপায় আমি যত্রতত্র যে-কোন লোকে ভ্রমণ করতে পারি। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই বীণাবাদন সহ প্রভুর গুণকীর্তন করি। সেই প্রেমময় ভগবান্ আমার হৃদয়ে সদা জাগরূক আছেন। যাঁরা আমার নিকট প্রভুর গুণকীর্তন শুনেন, তাঁরা শান্তি ও মুক্তি লাভ করেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "নারদ ও শুকদেব জীবন্মুক্ত পুরুষ। মানব-জাতির কল্যাণের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তাঁরা বার বার জন্মগ্রহণ করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখি যে, যখনই কোন ধর্মপিপাসু ব্যক্তির মনে ভগবান্ লাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা উদিত হয়, সেখানেই নারদ গুরুরূপে আবির্ভূত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হ'তে গেলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কৃপা প্রয়োজন। তুমি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারো, হৃদয়ঙ্গম করতে পারো, বিশ্বাস করতে পারো—কিন্তু এ-সব থেকে তুমি ধর্মলাভ করতে পারবে না, ভগবদ্জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে না। তাত্ত্বিক বিদ্যা বা শাস্ত্রের উপর পাণ্ডিত্য তোমাকে আধ্যাত্মিক করবে না।

প্রয়োজন আত্মানুভূতির। আর এই অনুভূতি যাতে তোমার হৃদয়কে উন্মোচিত করতে পারে, তার জন্য দরকার এক ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দিব্য স্পর্শ। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় অবতারগণ ধর্ম দিতে পারেন। তাঁরা কটাক্ষে বা স্পর্শমাত্রে অপরের মধ্যে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন। খ্রীষ্টধর্মে একেই আধ্যাত্মিক[১] শক্তি বলেছে। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করেই হস্ত-স্পর্শের[২] কথা বাইবেলে কথিত হয়েছে। আচার্য প্রকৃতপক্ষেই শিষ্যগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেন। একেই গুরুপরম্পরাগত শক্তি বলে। এই গুরুশক্তি পরম্পরা-ক্রমে চলতে থাকে। যীশু, বুদ্ধ বা শ্রীরামকৃষ্ণের মতো গুরু সব সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু শিষ্যগণের মধ্যে সঞ্চারিত তাঁদের সেই শক্তি থেকে যায় এবং পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে। ধর্মার্থীর ইষ্টদেবতার পবিত্র নামের মাধ্যমে শিষ্যের মধ্যে বীজাকারে এই শক্তি সঞ্চারিত হয়। শিষ্য ঐ পবিত্র মন্ত্র জপ ক'রে বীজের পুষ্টিসাধন করেন, এবং ক্রমে ঐ বীজ ফলে ফুলে শোভিত এক বৃক্ষে পরিণত হয়। ক্রমে শিষ্যই হয়ে ওঠেন গুরু। গুরুশক্তি মানবিক শক্তি নয়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় এটা "সৎ-চিৎ-আনন্দের শক্তি—স্বয়ং ভগবান্।"

কোন বিষয় পাঠ করবার পূর্বে পাঠের উদ্দেশ্য জানা প্রয়োজন। যেমন কেউ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, সাহিত্য, চিকিৎসা বা আইন পড়বার পূর্বে ঠিক করে তার উদ্দেশ্য কি। ঠিক তেমনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের পূর্বে উদ্দেশ্য বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। এর উদ্দেশ্য কি?—ভগবান্ লাভের পথ জানা।

ঈশ্বরই সদা বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ কি? অবশ্য এ কথা সত্য যে, তর্কশাস্ত্র-সম্মত এবং সম্ভবতঃ বহু বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। আবার এও সত্য যে, এমন অনেক

১ Holy Ghost
২ Laying on of hands

পণ্ডিত ও দার্শনিক ব্যক্তি আছেন—যাঁরা ভগবান্ মানেন না, তাঁদের যুক্তিগুলিও বিরুদ্ধবাদীদের মতো তর্কশাস্ত্র-সম্মত। ভারতের দার্শনিক ঋষি শঙ্কর বলেছেন যে, যুক্তির দ্বারা ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ করলেও শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল পণ্ডিত ও দার্শনিকদের এই আলোচনা করবার জন্য একত্র সমাবেশ করা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত প্রমাণ কোথায়? প্রকৃত প্রমাণ হ'ল—ভগবানকে জানা যায় এবং উপলব্ধি করা যায়। যেমন শঙ্কর বলেছেন: ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই প্রামাণিক ব'লে গণ্য করা যায় না, শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতি প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে না চলার শক্তি অর্জন কর, ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলবে, তারপর তাকেও ছাড়িয়ে যাবে। গ্রন্থ কখনও শেষ কথা নয়। সত্য প্রতিপাদনই ধর্মীয় সত্যের একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যেকে নিজে সত্য প্রতিপাদন করবে। যে গুরু বলেন, 'আমি দেখেছি, কিন্তু তুমি পাবে না', তাঁকে বিশ্বাস কোরো না, বিশ্বাস করবে শুধু তাঁকে, যিনি বলেন, 'তুমিও দেখতে পাবে।' সকল দেশের, সকল যুগের সকল ধর্মশাস্ত্র ও সকল সত্যই বেদ, কারণ ঐ সকল সত্য প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং যে কোন ব্যক্তি তা আবিষ্কার করতে পারেন।" কেবল এই অর্থেই হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, বেদের আরম্ভ নেই, শেষও নেই।

সাধক যদি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শাস্ত্রোক্ত সত্যসকল নিজ জীবনে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা না করেন, তবে তাঁর শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু নিজ জীবনে শাস্ত্রীয় সত্য প্রতিপাদন করে না, তাকে মহম্মদ পুস্তকের ভারবহনকারী গর্দভের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

অবশ্য এই চোখ দিয়ে কেউ ভগবান্‌কে দেখতে পায় না, এই কান

দিযে তাঁর কথা শুনতে পায না, তবুও তাঁকে দেখা যায, তাঁর কথা শোনা যায, পবিশেষে তাঁর সঙ্গে মিলনও হয। ভগবদ্গীতায শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয বন্ধু ও শিষ্য অর্জুনকে বলেছেন, "এই মনুষ্য-চক্ষু দিযে তুমি আমার এই বিশ্বরূপ দেখতে পাবে না, তাই আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিচ্ছি।"

বাইবেলের প্রার্থনাসঙ্গীত-বচযিতা বলেছেন, "প্রভু, তুমি আমার চোখ খুলে দাও, যাতে আমি তোমার অনুশাসন-বহির্ভূত বিস্ময়কর বস্তু-সমূহ দেখতে পাই।" দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দিব্যদৃষ্টির উন্মোচনকে 'চতুর্থ অবস্থা' বলা যায। এই অবস্থা চিরপরিচিত জাগ্রৎ স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রযের ঊর্ধ্বে। এই অতীন্দ্রিযজ্ঞান-বিকাশের শক্তি আমাদের সকলেরই আছে। দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যজীবন লাভ করতে হ'লে প্রযোজন – গুরুকৃপা, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের স্পর্শ, যিনি আমাদের পথ দেখাবেন, আর প্রযোজন গুরু- ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। যীশু বলেছেন, "আমি সত্য সত্যই তোমাদের বলছি যে, বারি-সিঞ্চন দ্বারা আত্মায অভিসিক্ত না হ'লে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।" গুরুকর্তৃক দীক্ষা এবং বারি-সিঞ্চনের দ্বারা খ্রীষ্টীয় দীক্ষা একই বস্তু। যীশু একেই বারি-সিঞ্চন দ্বারা অভিষেক বলেছেন এবং আত্মার অভিষেক হ'ল দিব্যদৃষ্টি লাভ। তার পর গুরু-প্রদর্শিত পথে শিষ্য যতই সংগ্রাম ক'রে এগোতে থাকে, ততই সে বুঝতে পারে যে, এ কেবল নিজের প্রচেষ্টা নয, ভগবানের কৃপাতেই সে তাঁর দর্শন ও তাদাত্ম্য লাভ করেছে। এটা বাস্তবিকই ঈশ্বরের দান।

পরে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে। এই ঈশ্বর-দর্শনের প্রযোজন কি? এর উত্তর পূর্বেই উল্লেখ করা হযেছে—যেখানে সনৎকুমার নারদকে বলছেন: "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পরাভক্তির সংজ্ঞা

নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে নারদ ভক্তিযোগের সহিত অন্য যোগগুলিকে মিলিত করেছেন: কর্মযোগ—নিষ্কাম কর্মের পথ, ভগবানে কর্মফল সমর্পণ, জ্ঞানযোগ—জ্ঞান বা বিচারের পথ; রাজযোগ—ধ্যানের পথ।

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

এখন আমরা ভক্তি বা ঈশ্বরীয় প্রেমের ব্যাখ্যা করিব।

অথ (এখন) এই শব্দ ব্যবহার করার অর্থ এই যে, যারা শিক্ষার্থী তারা ইতঃপূর্বে কিছু আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেছে, এবং ঈশ্বরীয় প্রেমের প্রকৃতি বুঝতে তারা সক্ষম। সাধকের প্রধান গুণ এই হওয়া চাই যে, তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী অর্থাৎ ঐ বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে তিনি ইচ্ছুক। যার ভগবান্‌কে উপলব্ধি করার আগ্রহ নেই, তাকে শতবার বক্তৃতা শোনালেও কোন কাজ হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। হাজার লেকচার দাও, বিষয়ী লোকের কিছু করতে পারবে না।"

ঈশ্বরের অভাব সকলে অনুভব করে না। এমন অনেক লোক আছে, যারা মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচর এই সংসারে যা পাওয়া যায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু এমন এক সময় আসে, যখন উন্নতি ও ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এবং জীবনে নৈরাশ্য অনুভব ক'রে লোকে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের উপাসকগণকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণীর উপাসক দুর্দশাগ্রস্ত এবং সংসারযাত্রায় ক্লান্ত। তাঁরা নিজেদের দুঃখকষ্ট দূর করবার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান ও তাঁর শরণাগত হন।

আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন, যাঁদের বাসনা পূর্ণ হয়নি। বাসনা-পূরণের আর কোনও উপায় না দেখে তাঁরা ভগবানের পূজা করেন ও তাঁর শরণাগত হন। আরও এক শ্রেণীর উপাসক আছেন, যাঁরা জ্ঞান-পিপাসু। তাঁরা অনুসন্ধান করেন—সংসারের এই বাহ্য রূপ কি সত্য, না এর বাইরে আরও কিছু আছে?

সকলের শেষে আছেন এক শ্রেণীর উপাসক, যাঁরা তত্ত্ববিচার করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ভগবান্‌কে ভালবাসা ছাড়া বাকী সবই অসার। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তিনি উপলব্ধি করেন যে, একমাত্র ভগবান্‌ই সত্য; এবং তাঁর মনে হয় যে, এই জাগতিক কার্যকলাপ নীরস, প্রাণহীন ও মূল্যহীন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, মানুষ এই চার প্রকারের:

"(জ্ঞানী) আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই আমি তাঁকে আত্ম-স্বরূপ ব'লে দেখি। আমাতে সমাহিতচিত্ত জ্ঞানীর শেষ ও একমাত্র আশ্রয় আত্মস্বরূপ আমি।"[১]

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পূর্বোক্ত চার প্রকার ভক্ত—সকলেই মহান্।

প্রকৃত তথ্য এই যে, যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, সাধক যদি ভগবানের উপাসনা করেন এবং তাঁর নিকট নিজেকে সমর্পণ করেন, তা'হলে তাঁর উপাসনায় তিনি আনন্দের স্বাদ পাবেন এবং সকল প্রকার বাসনা থেকে মুক্ত হবেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ধ্রুবের জীবনকাহিনী-বর্ণনায় এই বিষয়ের ব্যাখ্যা করা

১ গীতা, ৭।১৮

হয়েছে। ধ্রুব রাজপুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে নিরুপায় হয়ে তাঁকে তাঁর মায়ের দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে বাস করতে হয়। তিনি উপলব্ধি করলেন, যে-রাজ্যে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজা হবেন, সেই রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তাঁকে ও তাঁর মাকে একমাত্র ভগবান্‌ই সাহায্য করতে পারেন। সেই জন্য তিনি এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং ঐকান্তিক আগ্রহের সহিত ব্যাকুলভাবে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। নারদ অনুভব করলেন যে, এই বালক আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী। তাই তিনি ধ্রুবের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের রহস্য সম্পর্কে তাঁকে শিক্ষা দিলেন। নারদের উপদেশমত সাধন করতে করতে তিনি শ্রীভগবানের দর্শনলাভ করলেন। কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, ধ্রুবের ইষ্টমূর্তিতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে ভগবান্ তাঁকে বললেন, "তোমার বাবা তোমাকে ও তোমার মাকে ফিরে পেতে চান, তিনি তোমাকে রাজমুকুট দেবেন।"

কিন্তু ধ্রুব বললেন, "তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আর রাজত্বে প্রয়োজন কি?" শ্রীভগবান্ বললেন, "তোমার রাজা হবার বাসনা ছিল, তোমাকে রাজা হ'তে হবে। আমি তোমাকে রাজা হবার বর দিচ্ছি।"

অবশেষে ধ্রুব সম্পূর্ণভাবে ভগবানের শরণাগত হয়েছিলেন।

ভগবৎপ্রেমের পথ অনুসরণ করবার জন্য একটিমাত্র গুণের প্রয়োজন; তা হ'ল ভগবানের অভাব অনুভব করা এবং তাঁর শরণাগত হতে চাওয়া। অন্য পথগুলির সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। উদাহরণস্বরূপ জ্ঞানপথ অনুসরণের কথায় বলা হয়, "তিনিই ব্রহ্মানুসন্ধানের যোগ্য ব্যক্তি ব'লে বিবেচিত হন, যাঁর সদসদ্-বিচারবুদ্ধি আছে, যাঁর মন ভোগসুখে বিমুখ, যিনি প্রশান্তি এবং অন্যান্য অনুরূপ গুণের অধিকারী এবং যিনি মুক্তিকামী" (—শংকর)। অপর দিকে স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, "ভক্তের পক্ষে

তার কোন আবেগ সংযত করার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন শুধু, সেই আবেগগুলিকে তীব্রতর করা এবং সেগুলিকে ভগবদ্‌মুখী করা।"

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য ও সখা অর্জুনকে বলেন, "অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যাভক্তির সহিত আমাকে ভজনা করেন, তাঁর সংকল্প সাধু ব'লে তিনিও সাধু। তিনি শীঘ্র ধার্মিক হন ও চিরশান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! নিশ্চয় জানবে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।"[১]

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে বলেন, "আন্তরিকভাবে ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে, তারই হবে, হবেই হবে। যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে।"

'অতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ'—অতএব ভক্তিতত্ত্ব বা ভগবৎপ্রেমের ধর্ম ব্যাখ্যা ক'রব। 'অতএব' এই শব্দটির তাৎপর্য কি? ঈশ্বরীয় প্রেমের ধর্ম ব্যাখ্যা করবার জন্য ঋষিতুল্য গ্রন্থকার নারদ কোথা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন? তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন এই কারণে যে, যদি কোন ভক্ত ভগবৎপ্রেম লাভ করেন, সেই প্রেমই ভগবদুপলব্ধি করতে ও সর্বভূতে পরমাত্মার সহিত ভক্তের একত্ব অনুভব করতে সেই ভক্তকে সোজাসুজি চালিত করে এবং এই প্রেমই সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও সহজ পথ। কারণ প্রত্যেকের হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রয়োজন শুধু সেই ভালবাসাকে ভগবন্মুখী করা।

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা॥ ২॥

একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমকে ভক্তি বলে।

নারদ এই সূত্রে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তার পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন 'অস্মিন্' বা 'ইহাতে' সর্বনাম—যা অনির্দিষ্ট ও ক্লীবলিঙ্গ।

১ গীতা, ৯।৩০-৩১

ঈশ্বর, ব্রহ্ম, আত্মা, রাম, কৃষ্ণ অথবা অন্য কোন দেবদেবীর নাম ব্যবহার না ক'রে নারদ কেন 'অস্মিন্' সর্বনামটি ব্যবহার করলেন ?

একটি কারণ এই যে, তিনি তাঁর উপদেশগুলিকে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক করতে চেয়েছিলেন। 'ঐ'-সর্বনামের বদলে 'এই'-সর্বনামের ব্যবহার এই ইঙ্গিত দেয় যে, প্রকৃত সত্তা—তাঁকে যে-নামেই অভিহিত করা হোক্ না —তিনি আমাদের অন্তরতম পরমাত্মা, আমাদের অন্তরঙ্গতম অপেক্ষা অন্তরঙ্গ ; এবং এই সত্তা আমাদের হৃদয়মন্দিরে ও সর্ব জীবের হৃদয়ে বিরাজিত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্গীয় দৃষ্টি লাভ করলে পরমাত্মার দর্শন হয়। নারদ এই গ্রন্থে কোথাও ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি , কারণ সংজ্ঞা নির্দেশ করলে ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু ঈশ্বর দর্শন করবার পর সেই দর্শনের বিষয় কেউ ভাষা দ্বারা প্রকাশ করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু—মুখে বলার শক্তি থাকে না।"

কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, বড় বড় মুনি-ঋষিগণ ঈশ্বরেব অস্তিত্বের বিষয় প্রকাশ করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেন তিনি সাকার, কেউ বলেন নিরাকার, কেউ বলেন তিনি সগুণ, কেউ বলেন নির্গুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শনের আলোকে সহজ কথায় এই সব বিরোধী মতের সমন্বয় করেছেন : "তাঁর ইতি করা যায় না। যদি ঈশ্বর-দর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে— ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। আরও তিনি কত কি হয়েছেন বলা যায় না।

"কি রকম জানো ? সচ্চিদানন্দ যেন অনন্ত সাগর। ঠাণ্ডায় গুণে

যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানা রূপ ধ'রে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে ; তেমনি ভক্তি-হিম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞান-সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়, আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ ; জলে জল।

"যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' বোধ থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বর সাকার ; তার সাকার রূপ দেখাও যায়। এই দ্বৈতবোধ ব্রহ্মজ্ঞানের বাধা স্বরূপ। কালী বা কৃষ্ণের রং গাঢ় নীল বলা হয়েছে। কেন? কারণ ভক্ত তখনও তাঁদের কাছে আসে নাই। দূর থেকে হ্রদের জল নীল দেখায়। কাছে এস, দেখবে জলের কোন রং নাই। ঠিক এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে ব্রহ্ম তখন নিরাকার। ব্রহ্ম কী, তা মুখে বলা যায় না।"

নিজ নিজ রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী ভক্তগণ সাকার ও সগুণ ঈশ্বরকে বিষ্ণু, শিব, কালী, জিহোবা, আল্লা ইত্যাদি রূপে অথবা ঈশ্বরের অবতার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা রামকৃষ্ণ রূপে উপাসনা করেন।

নারদ ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম। ভগবৎপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করলে ভক্ত-হৃদয়ে যে প্রেমের উদয় হয়, সেই প্রেমকে ঋষি 'পরম প্রেম' বলেছেন। পরবর্তী সূত্রগুলিতে এই প্রেমের প্রকৃতিবর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এই প্রেমই ভগবৎ-চেতনা।

'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক' নামক স্থানে কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ কিছুক্ষণ নারদীয় ভক্তিসূত্রের পাঠ দেবার সময় এই সূত্রটির অনুবাদ ক'রে মন্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নিম্নলিখিত কথাগুলির উল্লেখ করেন : "এই সংসার একটা বিরাট পাগলা-গারদ, এখানে সবাই পাগল ; কেউ পাগল টাকার জন্য, কেউ মেয়ে-মানুষের জন্য, আবার কেউ বা নাম-যশের জন্য। ঈশ্বরের জন্য পাগল হয় ক'জন? ঈশ্বর স্পর্শমণি, স্পর্শমাত্র আমাদের সোনাতে পরিণত করেন।

আকার থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। মানুষের আকার থাকে, কিন্তু আমরা কারও ক্ষতি করতে বা পাপ কাজ করতে পারি না।

"ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে করতে কেউ কাঁদে, কেউ গান গায়, কেউ নাচে, কেউ বা আশ্চর্য আশ্চর্য কথা বলে, কিন্তু ঈশ্বরের বিষয় ছাড়া তাদের মুখে আর কোন কথা থাকে না।"

যখন আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা আমরা অনুভব করতে পারি, তখনই এই সর্বগ্রাসী প্রেমের উদয় হয়। ঈশ্বরদর্শনে উল্লাসবোধের সময় এর আভাস পাওয়া যায়।

আমার গুরুদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন আমাকে বলেছিলেন, "আমাদের ভালবাসা এত গভীর যে, জানতে দিই না তোদের কত ভালবাসি।" বাস্তবিক আমাদের প্রতি, সর্বজীবের প্রতি ভগবানের ভালবাসাও ঠিক ঐরূপ। সমাধিমগ্ন হয়ে ভগবৎপ্রেম উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক সাধনা।—"বুদ্ধির অগম্য যীশুখ্রীষ্টের প্রেম জানতে পারলে ঈশ্বরের পূর্ণতাদ্বারা তুমি ভরপুর হয়ে যাবে।"[১]

ভক্তি দুই প্রকার, গৌণী ও পরা। 'গৌণী'-ভক্তির সাধনার দ্বারাই 'পরা'-ভক্তি—ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম লাভ করা যায়।

ভক্তি-পথে সাধক কি কি উপায়ে বা কি কি বিশেষ প্রণালীতে সাধনা করবেন, পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে নারদ তা ব্যাখ্যা করেছেন।

এই সকল সাধনা অভ্যাস করতে করতে প্রথমে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, ঈশ্বর আছেন। অন্য কথায়, তাঁর সত্তার আভাস আমরা পাই। এখন পর্যন্ত আমরা তাঁর দর্শন পাইনি, কিন্তু অন্তরে অনুভব করছি এক মাধুর্য, আনন্দ ও শিহরণ; এবং দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, তিনি আমাদের অন্তরতম চিন্তা-ভাবনার বিষয় অবগত আছেন। তার পর ভগবৎ-সত্তার

১ "To know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God." Eph. 3. 19

সাধনা আরও অভ্যাস করলে তার কৃপায় আমাদের দৃষ্টি উন্মীলিত হয়। কঠ-উপনিষদে লিখিত আছে : "যে ব্যক্তি অনুভব করেন যে, ঈশ্বর সত্যই আছেন, তাঁর নিকট তাঁর তত্ত্ব তিনি উদ্ঘাটন করেন।"[১] সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভালবাসাও আমরা কিছুটা জানতে পারি এবং উপলব্ধি করি যে, তিনি—কেবল তিনিই আমাদের প্রিয়। কিন্তু নারদের মতে সমাধিতে ঈশ্বরদর্শন অপেক্ষা 'পরম প্রেম' কিছু বেশী।

পরম প্রেমের অর্থ ব্যাখ্যা করবার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে, ভক্তি-পথের সাধক উপাসনা করতে আরম্ভ করেন ঈশ্বরের সাকার রূপ, যথা—বিষ্ণু, শিব, কালী ইত্যাদি।

সম্ভবতঃ পাশ্চাত্য ভক্তগণের নিকট খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারগণের পূজা সহজবোধ্য হবে।

অবশ্য বৈদান্তিক মতে অবতার একটিমাত্র নন। এক ঈশ্বর বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন নামে অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : "যখনই ধর্মের পতন ও অধর্মের উত্থান হয়, তখনই আমি দেহ ধারণ করি। সাধুগণের রক্ষার জন্য ও দুষ্টের বিনাশের জন্য এবং ধর্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"[২]

ঈশ্বরের অবতারগণকে পূজা ও ধ্যান করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "কর্তা ও কর্ম উভয়েই ঈশ্বর। তিনি 'আমি'ও বটেন এবং 'তুমি'ও বটেন। এটা কিভাবে সম্ভব? জ্ঞাতা কিরূপে নিজের স্বরূপকে জানতে পারেন? জ্ঞাতা নিজেকে জানতে পারেন না। আমি সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাকে দেখতে পাই না। আত্মা, যিনি জ্ঞাতা, সকলের প্রভু, প্রকৃত সত্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তু দর্শনের তিনিই কারণ, তার পক্ষে নিজের স্বরূপকে দেখা বা জানা

১ কঠ ২।৩।১৩
২ গীতা ৪।৮

প্রতিফলন ব্যতীত সম্ভব নয়। আয়না ব্যতীত তুমি তোমার নিজের মুখ দেখতে পাও না। সেইরূপ আত্মাও প্রতিফলিত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় স্বরূপ দেখতে পান না। অতএব, এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আত্মাই—যিনি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছেন। প্রতিফলন আরম্ভ হয় প্রথমে প্রোটোপ্লাজম থেকে, পরে উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু থেকে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নততর প্রতিফলক থেকে এবং শেষ হয় সর্বোত্তম প্রতিফলকে—পূর্ণ মানবে। ঘোলা জলে মুখ দেখলে মুখের বাইরের রেখাটি মাত্র দেখা যায়, আর পরিষ্কার জলে প্রতিবিম্বটি কিছু ভাল দেখায়; কিন্তু আয়নার ভিতর দেখলে, যিনি দেখেন, প্রতিবিম্বটি ঠিক তাঁরই মতো দেখায়। যিনি উভয়তঃ কর্তা ও কর্ম, সেই পরম সত্তার স্পষ্টতম প্রতিবিম্ব হচ্ছেন পূর্ণ মানব (অবতার)। এই কারণেই পূর্ণ মানব স্বতই প্রত্যেক দেশে পূজিত হন। তাঁরা শাশ্বত আত্মার পূর্ণতম প্রকাশ। সেই জন্যই লোকে খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারগণের উপাসনা করে।"

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দুটি অবস্থা আছে। প্রথম অভিজ্ঞতাকে বলা হয়—সবিকল্প সমাধি; ভক্ত তাঁর ইষ্টদেবেব দর্শন পান, সেই সঙ্গে অনুভব করেন এক অবর্ণনীয় আনন্দ। তখনও ঈশ্বর থেকে পার্থক্যবোধ থাকে। কিন্তু আরও উচ্চতর অবস্থায় প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়ে যায়। এই সমাধিতে ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণ মিলন ঘটে, এর নাম নির্বিকল্প সমাধি। তখন ঈশ্বর নিরাকার, বিশ্বব্যাপী ও ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ব'লে অনুভূত হন। এই অভিজ্ঞতাই পরম প্রেম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে বলেছেন, "এ প্রেম হ'লে জগৎ ভুল হয়ে যাবেই। আবার নিজের দেহ যে এত প্রিয়, তাও ভুল হয়ে যায়। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যায়।"

এই পরম প্রেম অবর্ণনীয় স্বর্গীয় আনন্দের সর্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতা; এই অভিজ্ঞতা হ'লে 'অহং' সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

যাঁরা ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলন লাভ করেছেন, যাঁরা ঈশ্বরকে তাঁদের নিজেদের অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মারূপে অনুভব করেছেন, সেই সব সাধু-সন্তদের উদাহরণ দেবার পূর্বে ভগবৎপ্রেমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ প্রকৃত ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসার জন্যই ভালবাসেন। এ প্রেমে দর-দস্তুর বা দোকানদারির স্থান নেই। ভক্ত এমন কি নিজের মুক্তিও চান না; তা হলেও তিনি মুক্ত হন।

ভগবৎপ্রেমের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই প্রেমে ভয়ের স্থান নেই। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, মানুষের দুর্বলতার জন্য শাস্তির ভয়ে ঈশ্বরের পূজা করা নিম্নস্তরের ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবী একদিন বলেছিলেন, "ছেলে কাদা নিয়ে খেলতে গিয়ে গায়ে কাদা মাখলে মা কি ছেলেকে ফেলে দেন, না তুলে ধুলো কাদা ধুয়ে-মুছে ছেলেকে কোলে করেন?" আমাদের মাতাপিতা অপেক্ষা ঈশ্বর আমাদের আপন জন। কেবল মাত্র তিনিই প্রেমস্বরূপ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'ভগবানের চোখে পাপ ব'লে কি কিছু আছে? তুলোর গাদায় দেশলাই জেলে আগুন ধরালে তুলো যেমন ক্ষণিকের মধ্যে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়, তেমনি ঈশ্বরের একটি মাত্র দৃষ্টিপাতেই সব পাপ পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।'

সর্বশেষে, প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানে না। ভক্তের নিকট একমাত্র প্রিয় হলেন ঈশ্বর। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রার্থনায় বলেন, "হে ভক্তজনের হৃদয়-হরণকারী প্রভু! তুমি আমার হৃদয়বল্লভ, তুমি আমাকে নিয়ে যা খুশি কর।"[১]

এখন প্রথমে আমি হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের সাধুসন্তগণ, যাঁরা প্রেমের দ্বারা পূর্ণ মিলন উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের উদাহরণ দিচ্ছি।

অল্ হাল্লাজ নামক এক সুফি পরম সত্য উপলব্ধি ক'রে ঘোষণা

১ শিক্ষাষ্টকম্, ৮

করেছিলেন, "আমি সত্য। আমিই তিনি, যাঁকে আমি ভালবাসি ; এবং যাঁকে আমি ভালবাসি, তিনিই আমি।"

হজরত মহম্মদের বাণী : "ইন্ নি—অন্ আল্লাহু লা ইল্লাহা আনা" —ইশাইয়ার সঠিক অনুবাদ—"নিশ্চিত আমি, এমন কি আমিই ঈশ্বর, সেখানে আর কেহ নাই।"

সেণ্ট পল বলেছেন, "ভগবানের সহিত এক হওয়াই সব চেয়ে ভাল।"

ডায়োনিসিযাস বলেছেন, "প্রেমের প্রকৃতি এরূপ যে, মানুষ যাকে ভালবাসে, প্রেম সেই মানুষকে তাতেই রূপান্তরিত করে।"

জার্মান অতীন্দ্রিয়বাদী মেস্টার একহার্ট বলেছেন, "সূর্য যেমন উষাকে আত্মসাৎপূর্বক তাকে নির্বাপিত করে, তেমনি আত্মা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হ'লে ঈশ্বরে মগ্ন হয়ে যান, তখন আর তাঁর কোন অস্তিত্ব থাকে না।··· এমন কিছু লোক আছে, যারা মনে করে যে, ঈশ্বর বাস করেন সেখানে, আর তারা বাস করে এখানে। এরূপ মনে করা ঠিক নয়। ঈশ্বর ও আমি এক ও অভিন্ন।"

সর্বোত্তম ঈশ্বরদর্শন-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, "তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বই শুধু উপলব্ধি করেন না, পরন্তু জানেন যে তিনি সাকার ও নিরাকার, যিনি তাঁকে খুব ভালবাসেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন ও তাঁর আনন্দ উপভোগ করেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অবিভাজ্য নৈর্ব্যক্তিক সত্তার সহিত একাত্মতা লাভ ক'রে ধ্যানে নিমগ্ন হ'লে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন। স্বাভাবিক চেতন অবস্থায় ফিরে আসবার পরও সেই আনন্দ উপলব্ধি করেন ও দেখেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেরই প্রকাশ ও তাঁর লীলা।"

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : "যোগযুক্ত পুরুষ স্বীয় আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে স্বীয় আত্মাতে দর্শন করেন।"[১]

---

১ গীতা, ৬।২৯

শ্রীচৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন, "শ্রীচৈতন্যদেবের তিনটি অবস্থা ছিল। অন্তর্দশায় সমাধিস্থ, বাহ্যশূন্য। অর্ধবাহ্যদশায় আবিষ্ট হয়ে নৃত্য করতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। বাহ্যদশায় সংকীর্তন।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা পাঠ করি, শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত প্রহ্লাদ যখন ব্রহ্মভাবে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতেন, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড ও তার কারণ কিছুই দেখতে পেতেন না। নাম ও রূপ দ্বারা সংঘটিত পার্থক্য বিরহিত হয়ে সকল বস্তু এক অসীম সত্তারূপে প্রতিভাত হ'ত। তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ ফিরে এলে পর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অসংখ্য স্বর্গীয় গুণের আধার সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু তাঁর সম্মুখে উদয় হতেন। বৃন্দাবনের গোপীদেরও অনুরূপ অবস্থা হ'ত। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে তাঁরা কৃষ্ণের সহিত মিলন অনুভব করতেন এবং নিজেরাই কৃষ্ণ হয়ে যেতেন। কিন্তু যখন বোধ হ'ত যে, তাঁরা গোপবালিকা, তখন তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করতেন আর তখনই তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হতেন—'পীতবসন-পরিহিত মালাভূষিত প্রেমময়ের মূর্তপ্রতীক শ্রীকৃষ্ণ, কমল-আননে মৃদু হাসি।'

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা দেখতে পাই, দিনের মধ্যে তিনি বহুবার সমাধিমগ্ন হতেন। তখন তাঁর ব্রহ্মের সহিত একাত্মবোধ হ'ত। পরে সমাধি থেকে মন স্বাভাবিক চেতন-ভূমিতে নামলে তিনি আনন্দময়ী মায়ের কথা বলতেন।

অমৃতস্বরূপা চ ॥ ৩ ॥

এই স্বর্গীয় প্রেম—তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিতে অবিনশ্বর স্বর্গীয় আনন্দ।

এই অবিনশ্বর স্বর্গীয় আনন্দের সত্য প্রকৃতি কি? এই প্রকৃতি অবিমিশ্র আনন্দ ও স্বর্গসুখের অবস্থা। আমার গুরুদেব আমাকে একদিন

বলেন, "লোকে জীবন উপভোগ করার কথা বলে। কিন্তু যারা বিষয়াসক্ত ও রিপুতাড়িত, তারা জীবনের আনন্দের কি জানে? যারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর মধ্যে মাধুর্যের সন্ধান পায়, তারাই কেবল জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করে।" সংস্কৃতে একটি কথা আছে: 'মাধব' অর্থাৎ যিনি মধুময়। এটি শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাঠ করি: "পরম সত্তার অস্তিত্বই আনন্দের উপাদান। সেই আনন্দময় সত্তা হৃদয়কমলে বিরাজিত না থাকলে কি কেউ জীবন ধারণ ও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করতে পারে?"[১]

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখা যায়: "কলঙ্কিত একখণ্ড ধাতু মাজা-ঘষা করলে উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ এই দেহমধ্যে যিনি বাস করেন, তিনি যখন আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করেন, তখন তাঁর দুঃখ দূর হয় এবং তিনি আনন্দ লাভ করেন।"[২]

বাইবেলেও অনুরূপ সত্য আবিষ্কার করা যায়: "ঈশ্বর যাদের উদ্ধার করেন, তারা গান গাইতে গাইতে স্বর্গে ফিরে আসে। চিরস্থায়ী আনন্দ তাদের মাথার উপর থাকবে; তারা আনন্দ লাভ করবে এবং দুঃখ ও শোক দূরে পালিয়ে যাবে।"[৩]

যীশু বলেন, "তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর।"[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ঈশ্বর রসের সাগর।" একদিন তিনি যুবক শিষ্য নরেন্দ্রকে (পরে বিবেকানন্দ-নামে পরিচিত) বলেছিলেন, "'মনে কর্ যে এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোন্‌খানে বসে খাবি?' নরেন্দ্র বললে, 'আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব।' আমি বললুম, 'কেন মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ?' নরেন্দ্র বললে, 'তা হ'লে

১ তৈত্তিরীয়, ২।৭
২ শ্বেতাশ্বতর, ২।১৪
৩ Isa : 51 : 11
৪ Matt : 25 : 11

যে রসে জড়িয়ে মরে যাব।' তখন আমি বললুম, 'সচ্চিদানন্দ তা নয়, এ রস অমৃত রস। এতে ডুবলে মানুষ মরে না, অমর হয়'।"

এ আনন্দ অবিনশ্বর অর্থাৎ এর শেষ নেই। এ আনন্দে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হ'তে পারলে চিরকাল বাঁচা যায়। এই আনন্দ-লাভই ঈশ্বরলাভ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে বাসনা অনুযায়ী বস্তুলাভের দ্বারা সুখ ও আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। এই সুখ ও আনন্দ কোন কারণের ফল, তাই তারা অল্পক্ষণস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ। এ কথা সত্য যে, ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনা ও চেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু এইসব সাধনা ও চেষ্টা করা হয় ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করার জন্য এবং সেই কৃপা যখন অনুভব করা যায়, তখন মানুষ জানতে পারে যে, ভগবানের কৃপা ব্যতীত তার নিজস্ব চেষ্টা চালানো সম্ভব নয়।

আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, 'ঈশ্বর কোন পণ্যদ্রব্য নন যে তাঁকে কেনা যাবে। কেবলমাত্র তাঁরই কৃপায় লোকে ঈশ্বর-লাভের আনন্দ পায়।'

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

যাহা লাভ করিলে মানব চিরকালের জন্য সিদ্ধ হয়, অমর হয় এবং পরম তৃপ্তি লাভ করে।

'সিদ্ধ' এই কথাটি 'পূর্ণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আরও একটি অর্থ আছে—গুপ্ত শক্তি বা সিদ্ধাই। শেষোক্ত অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। একজন ভক্ত বা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী জানেন যে, না চাইলেও এই সব গুপ্ত শক্তি বা সিদ্ধাই আসতে পারে। কিন্তু এগুলিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অভীষ্টফল-লাভের বিঘ্নস্বরূপ জেনে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ভারতীয় যোগদর্শনের জনক, মহান্ যোগী পতঞ্জলি কয়েকটি সাধনার অভ্যাসদ্বারা বহু গুপ্তশক্তিলাভের আলোচনা করবার পর সব শেষে খুব জোর দিয়ে

নির্দেশ করেছেন যে, "জাগতিকভাবে এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু এই শক্তি-গুলিকে জয় করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি।" এরা কতগুলি প্রলোভন মাত্র, সাধককে প্রলোভিত ক'রে ঈশ্বরের পথ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এর প্রকৃত অর্থ এই যে, হৃদয়ে পরম প্রেমের উদয় হ'লে মানব পূর্ণ হয়। পূর্ণতালাভের অর্থ—ঈশ্বরের সহিত একত্ববোধ বা মানবের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তার প্রকাশ। যীশুখ্রীষ্টের বাণীতে আমরা পাই, "স্বর্গে অবস্থিত তোমার পিতা যেরূপ পূর্ণ, তুমিও সেইরূপ পূর্ণ হও।"[১] আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানবের অন্তর-প্রদেশকেই খ্রীষ্ট স্বর্গ বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই পূর্ণতা এমন কিছু নয় যা লাভ করা যায়, কারণ প্রকৃত সত্তা বা আত্মা ব্রহ্মের সহিত একীভূত। কেবল অজ্ঞতা আমাদের অন্তঃস্থিত ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ঢেকে রাখে এবং আমাদের দিব্যদৃষ্টিকে বাধা দেয়। যা আত্মা নয়, তাকে আত্মা ব'লে গণ্য করা অর্থাৎ নিজেকে মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ ব'লে গণ্য করাকে 'অহং' ভাব বলে, এবং এটা অজ্ঞতা। এই অহংভাব যখন বিলুপ্ত হয়, তখন অন্তঃস্থিত প্রিয়তম ঈশ্বরকে আত্মা ব'লে উপলব্ধি করা যায়, ঠিক যেমন পরম প্রেমের মাধ্যমে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক ব'লে মনে হয়।

এই পূর্ণতাকে আবার 'মোক্ষ' বলে। অজ্ঞতার সকল বন্ধন যখন ছিন্ন হয়, তখন মানব যে কেবল সকল প্রকার অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পায় তা নয়, কর্মের অনুশাসন, জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম থেকেও মুক্তি পায়। কর্মবিধান বললে সহজ কথায় বুঝায়—কার্য ও কারণের সূত্র। কার্য-কারণ-সূত্র যে কেবল প্রাকৃতিক জগতে কাজ করে তা নয়, এ সূত্র নৈতিক ও মানসিক জগতেও কাজ করে। "মানুষ যেমন বপন করে, সেইরূপ ফসল সে সংগ্রহ করবে।" এই হ'ল বিধি। আমাদের সুখ, দুঃখ—সবই

১ "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

আমাদের কর্মফল। তা ছাড়া এই কর্মের বিধি পুনর্জন্মগ্রহণের নিয়মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেন একজন ধনী ও আর একজন নির্ধন হয়ে জন্মগ্রহণ করে? কেনই বা একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং আর একজন নির্বোধ? জন্মাবধি কেন একজনের দেহ সুন্দর এবং অপরজন পঙ্গু বা অন্ধ? এটা যদি আমাদের প্রথম জন্ম হয়, তা হ'লে মানবজাতির মধ্যে এই পার্থক্যের জন্য দায়ী সৃষ্টিকর্তা। কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে কেউই শূন্য মন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, প্রত্যেকেরই থাকে কিছু না কিছু জ্ঞান। তাঁরা বলেন যে, এই জ্ঞান উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু ভারতে একে পূর্ব জন্মের সংস্কার ব'লে বিশ্বাস করা হয়। এইরূপে সকলে কর্ম ও জন্মসূত্রে আবদ্ধ থাকে, যতদিন তারা এই মিথ্যা 'আমি' বা অহং-ভাবের সঙ্গে নিজদিগকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ক'রে রাখে। কিন্তু যখন কেউ আত্মাকে নিজের প্রকৃত সত্তারূপে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি কর্ম ও পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হন। একেই 'মোক্ষ' বলা হয়।

উপনিষদে আমরা পাঠ করি, যখন কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন "হৃদয়ের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়, সকল প্রকার সংশয় দূর হয়।" এইরূপ লোক জীবন্মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নেই। কঠোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

"আত্মা সর্বদর্শী। তাঁর জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। তিনি কার্য নন, কারণও নন। এই প্রাচীন আত্মা জন্মরহিত, মৃত্যুরহিত এবং অবক্ষয়হীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা বিনষ্ট হন না।"[১]

"হননকারী যদি মনে করে যে, হত্যা ক'রব, বা হত ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি হত হয়েছি, তারা উভয়েই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানে না। আত্মা কাকেও হত্যা করেন না, এবং কারও দ্বারা নিহতও হন না।"[২]

---

১ কঠ, ১।২।১৮

২ কঠ, ১।২।১৯

"আত্মা অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ, মৃত্যুহীন, স্বাদহীন ও সনাতন ; তাঁর আরম্ভ নেই, শেষ নেই ; তিনি অপরিবর্তনীয় এবং প্রকৃতির পারে। আত্মাকে এইরূপ জানলে মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।"[১]

"অণুর থেকেও ক্ষুদ্র, বৃহত্তম থেকেও বৃহৎ এই আত্মা সকল জীবের মধ্যে বিরাজিত আছেন। বাসনার নিবৃত্তি হ'লে এবং মন ও ইন্দ্রিয় শুদ্ধ পবিত্র হ'লে আত্মার মহিমা দর্শন করা যায় ও জীব শোকাতীত হন।"[২]

স্বামী বিবেকানন্দ এ বিষয়ে তাঁর ধারণা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন : একজন লোক যেমন বই হাতে নিয়ে এক পৃষ্ঠা পড়েন, তার পর পৃষ্ঠা উলটিয়ে পর পৃষ্ঠা পড়েন, আবার সেই পৃষ্ঠা উলটান, এইভাবে পৃষ্ঠা উলটাতে উলটাতে পড়া চলে, বই আর তার পৃষ্ঠাগুলি উলটানো হলেও যিনি পড়েন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই থাকেন—ঠিক তেমনি আত্মার সম্বন্ধেও বলা যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন একটা বই এবং আত্মা সেই বই পড়ছেন। প্রত্যেক জীবন যেন বই-এর এক-একটি পৃষ্ঠা ; এক-একটি পৃষ্ঠা পড়া শেষ হলেই সেটি উলটানো হয় ; এইভাবে উলটানো চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বইটি পড়া শেষ না হয়, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে আত্মা পূর্ণতা প্রাপ্ত না হন। তা ব'লে [মনের] ঐ ক্রম-বিকাশের সময়ে আত্মা নড়েন না। কিন্তু আমাদের মনে হয়—যেন আমরা নড়ছি। পৃথিবী ঘুরছে ; আমরা মনে করি, পৃথিবী নয় সূর্য ঘুরছে। এ ধারণা যে ভুল, ইন্দ্রিয়ের বিভ্রান্তি, তাও আমরা জানি। আমাদের জন্ম হয়, মৃত্যু হয় ; আমরা আসি, আমরা যাই—এ সবই বিভ্রান্তি। আমরা আসি না, যাই না বা আমাদের জন্মও হয় না ; কারণ আত্মা কোথায় যাবেন ? যাবার স্থান যে তাঁর কোথাও নেই। তিনি কোথায় নেই ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'সিদ্ধ' শব্দটি নিয়ে কথার মারপেঁচ করতেন। 'জীবদ্দশায়

১ কঠ, ১।৩।১৫
২ কঠ, ১।২।২০

পূর্ণ ও মুক্ত' এই অর্থে আমি 'সিদ্ধ' কথাটি ব্যবহার করেছি। বাংলাভাষায় 'সিদ্ধ' কথাটি আর একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়—'আগুনের তাপে জলে বা কোন তরল পদার্থে কোন জিনিসের সিদ্ধ হওয়া।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বলতেন, "যখন কেউ সিদ্ধ হন (পূর্ণতা বা মুক্তি প্রাপ্ত হন) তখন তিনি সিদ্ধ আলু বা পটলের মতো নরম ও কোমল হয়ে যান।" অর্থাৎ তখন তাঁর হৃদয় অপরের প্রতি সহানুভূতিতে গলে যায়।

যা লাভ করলে মানুষ অমর হয়—'অমৃতো ভবতি'।

অমৃতত্ব বলতে ঠিক কি বুঝায়? একটা সাধারণ ভুল ধারণা আছে যে, অমরত্ব বা নিত্য জীবনও হচ্ছে স্থান ও কালের মধ্যে জীবনের বিস্তৃতি। বর্তমান বিজ্ঞান অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে যে, সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন অসম্ভব। কোন বস্তু বা জীবের অস্তিত্ব আছে বললেই বুঝায়—তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা আছে, যদিও সেই অস্তিত্ব বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন আকারে থাকতে পারে। আত্মা বা অন্তঃস্থিত ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে অমরত্ব-লাভের অর্থ স্থান বা কালের ভিতর অস্তিত্বের বিস্তৃতি নয়। এর অর্থ—আত্মা যে অবিনাশী ও স্থান-কাল-বহির্ভূত, এই তত্ত্বের উপলব্ধি। অন্য সব মহান্ ধর্মের অনুরূপ মতবাদ মুখ্যতঃ এ জগতে জীবদ্দশায় মানুষের উপলব্ধির ও পূর্ণতার জীবনের বিষয় শিক্ষা দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যীশুখ্রীষ্ট যখন নিত্যজীবনলাভের জন্য তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে আসতে বললেন, তখন তিনি কি অর্থে ঐ কথাগুলি বলেছিলেন? খ্রীষ্ট বা ব্রহ্মের নিকট আসা, নিজের স্বর্গীয় আত্মার নিকট আসা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং এই আত্মা কালাতীত। ঐ কাল আবার কেবলমাত্র স্থান ও মানবজীবনের অন্য হাজার হাজার অবস্থাসহ এই সীমাবদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে, এবং উচ্চতর আত্মার দ্বারা তখন পর্যন্ত জাগরিত হয়নি—এমন সব মানুষের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

'যল্লব্ধ্বা পুমান্ · তৃপ্তো ভবতি'—

জেকবের কূপ থেকে সামারিয়ার যে মহিলা জল নিতে এসেছিলেন,

তাঁকে যীশুখ্রীষ্ট যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করলেই সম্ভবতঃ আলোচ্য বিষয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করা হবে।

"এই জল পান করলে পুনরায় তৃষ্ণা পাবে; কিন্তু আমি যে জল দেবো তা পান করলে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। যে জল উদ্গত হয়ে শাশ্বত জীবনে প্রবেশ করবে এবং জলের কূপ হয়ে তার ভিতর থাকবে, আমি তাকে সেই জল দেব।"

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫ ॥

যাহা পাইবার পর মানুষ অন্য কিছু পাইবার বাঞ্ছা করেন না, তিনি আর কখনও শোক করেন না, তিনি ঘৃণা ও হিংসা হইতে মুক্ত হন, তিনি জীবনের অসার বস্তুতে আনন্দ লাভ করেন না এবং তিনি কোন বস্তু পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

নারদের এই সূত্রের অনুরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ সম্পর্কে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করা হল:

"আত্মজ্ঞানামৃত-রস-লাভে তৃপ্ত হয়ে যোগী যখন দুঃখদায়ক অন্তর্নিহিত বাসনাদি ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ব'লে উক্ত হন।

"যে মুনি দুঃখে বিচলিত হন না, সুখের জন্য লালায়িত হন না, যিনি আসক্তি-ভয়-ও ক্রোধ-রহিত—সেই মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

"যিনি সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তিতে আসক্তি-বর্জিত, প্রিয় বিষয় উপস্থিত হ'লে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিয় বস্তু উপস্থিত হ'লে দুঃখিত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।"[১]

১ গীতা, ২।৫৫-৫৭

এখন এই সূত্রটির প্রত্যেক অংশের অর্থ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

'যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি'—যাহা পাইবার পর মানুষ অন্য কিছু পাইবার বাঞ্ছা করেন না।

শঙ্কর বলেছেন, "প্রজ্ঞার ফল বাসনার নিবৃত্তি; নিবৃত্ত বাসনার ফল আত্মার আনন্দ-অনুভূতি। তাকে অনুসরণ ক'রে আসে শান্তি।"

সীমাবদ্ধ অবস্থা ও অপূর্ণতাবোধ থেকে উদ্ভূত হয় বাসনা। জ্ঞানীর অভাববোধ নেই; অন্য কী বস্তু পাবার বাসনা তিনি করতে পারেন? সংস্কৃতে দুটি শব্দ আছে—'নিষ্কাম' অর্থাৎ বাসনা-কামনা-রহিত এবং 'পূর্ণকাম' অর্থাৎ সকল বাসনার পূর্ণ সমাপ্তি। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পূর্ণকাম, কারণ তাঁর মধ্যে পূর্ণ সিদ্ধি বিরাজিত; লাভ করবার বা পাবার কোন বস্তু আর বাকী নেই। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে:

"তখন তিনি জানতে পারেন, পবিত্র হৃদয় দ্বারা অনন্ত সুখ উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সে সুখ ইন্দ্রিয়ের গোচর নয়। এই উপলব্ধিতে তিনি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সেই কারণে তিনি পুনরায় কখনও তাঁর অন্তরতম সত্য থেকে বিচ্যুত হন না।"[১]

এবং পরে বলা হয়েছে:

"তিনি এইরূপ উপলব্ধিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ব'লে জানতে পারেন যে, অন্য লাভ এই লাভ অপেক্ষা অধিক নয়।"[২]

আধ্যাত্মিক সত্যের সাধক ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য আছে। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে:

"বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ ব্যক্তি কামনার বস্তু থেকে নিবৃত্ত হন বটে, কিন্তু

১ গীতা, ৬।২১
২ গীতা, ৬।২২

সেই বস্তুগুলির প্রতি আসক্তি দূর হয় না। যখন কেউ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়েরই চিরতরে উচ্ছেদ হয়।"[১]

কিন্তু তাঁর একটি বাসনা থাকে—সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে সেবা কবার বাসনা। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের হৃদয় অপরের দুঃখ-দুর্দশায় বিচলিত হয়। তাঁর হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোর কি ভাল লাগে?" উত্তরে নরেন্দ্র বলেন, "আমার সমাধিমগ্ন হয়ে থাকতে ভাল লাগে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক চেতন-ভূমিতে ফিরে আসব খাদ্য ও পানীয়ের জন্য, তারপর আবার সমাধিমগ্ন হ'তে চাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তোর লজ্জা করে না? আমার ধারণা ছিল, তুই এ-সবের উপরে।" তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—মানব-জাতির সেবাদ্বারা ভগবৎসেবার আদর্শ কি—সে আদর্শ যে কেবল একা একা স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করা, তা নয়, বরং অপর সকলকে সেই সুখ উপভোগ করতে সাহায্য করা।

ভগবদ্গীতায় সত্যই বলা হয়েছে :

"যিনি ব্রহ্মস্বরূপ-লাভে আনন্দিত হয়ে নিজ অন্তরে প্রতিটি জীবের আনন্দে আনন্দ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন, ঐ আনন্দ ও দুঃখকে নিজের আনন্দ ও দুঃখ বলে মনে করেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।"[২]

'ন শোচতি'—তিনি আর শোক করেন না—তবে তিনি প্রতিটি জীবের দুঃখে দুঃখ বোধ করেন।

'ন দ্বেষ্টি'—হিংসা ও ঘৃণা থেকে তিনি মুক্ত।

অপূর্ণ বাসনা থেকে ঘৃণা ও হিংসার জন্ম হয়। যিনি তাঁর প্রিয়তমকে সর্বত্র দর্শন করেন, তাঁর হৃদয়ে হিংসার ও ঘৃণার স্থান কোথায়?

১ গীতা, ২।৫৯
২ গীতা, ৬।৩২

মনে কর, কোন লোক একজন সাধুকে আঘাত বা অপমান ক'রল। সাধুর প্রতিক্রিয়া কি হবে? শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীর গান' এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কয়েক জন মূর্খ একজন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীকে গুরুতর আঘাত ও অপমান করেছিল। তিনি যেতে যেতে আপন মনে বলতে লাগলেন, "যদি তুমি মনে কর যে, অপর কেউ তোমাকে সুখ বা দুঃখ দিচ্ছে, তুমি প্রকৃতপক্ষে সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব কর না; কারণ তুমি সেই আত্মা যার কোন পরিবর্তন হয় না। তোমার দেহ পরিবর্তন-শীল; সেই দেহের সঙ্গে ভুল ক'রে আত্মাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত কর; সেই কারণে তোমার সুখ ও দুঃখ বোধ হয়। তোমার আত্মাই সকলের মধ্যে প্রকৃত আত্মা। তুমি যদি দৈবাৎ নিজের জিভে কামড় দাও, যন্ত্রণার জন্য কার উপর রাগ করবে?"

'ন রমতে'—তিনি জীবনের অসার বস্তুতে আনন্দ লাভ করেন না।

তাঁর মন থাকে ব্রহ্মে, সেই নিত্যধনে লীন, যেখানে আছে স্থায়ী শান্তি। তাই স্বভাবতঃ অস্থায়ী আনন্দের দিকে তিনি আর তাঁর মন দিতে পারেন না।

প্লটিনাস যেমন বলেছেন, "সেখানে দুই নাই, আছে এক; আত্মা তখন আর দেহ মন সম্পর্কে সচেতন নন। তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু তিনি লাভ করেছেন এবং তিনি এমন স্থানে আছেন, যেখানে বঞ্চনার স্থান নেই; স্বর্গের বিনিময়েও তিনি সেই আনন্দ ত্যাগ করতে পারেন না।"

'নোৎসাহী ভবতি'—তিনি কোনও বস্তু পাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নিষ্ক্রিয় হন, কোন কাজ করেন না। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "আত্মাতে যিনি আনন্দ, তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করেন, তাঁর কাজ করার আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না। কাজ ক'রে তাঁর পাবার কিছু নেই, আর কাজ না ক'রে হারাবার কিছু

নেই।" শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর শিষ্যকে কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "তোমার কাজ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, অপরকে তোমার উদাহরণ দিয়ে কর্তব্য-সম্পাদনে প্রেরণা দেওয়া।"

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন, "অজ্ঞ ব্যক্তি কর্মফল-লাভের জন্য কাজ করে; বিজ্ঞ ব্যক্তি বাসনাশূন্য হয়ে কাজ করেন এবং লোককে কর্তব্য পথে চলতে নির্দেশ দেন। কর্মীর হৃদয় ঈশ্বরে নিবদ্ধ হ'লে কর্ম কিরূপ পবিত্র হয়, জ্ঞানীরা যেন তা উদাহরণ দিয়ে দেখান।"[১]

এই সূত্রের শেষ বাক্যের আর একটি অর্থ হয়: তিনি নিজে উদ্যোগী হন না অর্থাৎ স্বেচ্ছায় তিনি কোন কাজ করেন না। তিনি নিজের ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে প্রভুর ইচ্ছাতে সমর্পণ করেছেন। টেনিসন বলেছেন:

"আমাদের ইচ্ছা আমাদেরই; আমরা জানি না, আমাদের এই ইচ্ছাকে কেমন ক'রে তোমার ইচ্ছাতে পরিণত ক'রব।"[২]

আমার গুরুদেব স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আমার যে কথাবার্তা হয়েছিল তা হ'তে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কেমনভাবে শ্রীভগবানের ইচ্ছামত কাজ করেন, তার উদাহরণ পাওয়া যায়। একদিন তিনি আমাকে মাদ্রাজ থেকে যাত্রার শুভদিন স্থির করার জন্য পঞ্জিকা দেখতে আদেশ করলেন। পঞ্জিকা দেখবার সময় আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। মহারাজ আমাকে হাসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাসছিস্ কেন?" আমি উত্তর দিলাম, "কোথাও যেতে হ'লে আপনি প্রত্যেক বার পাঁজি দেখতে বলেন, কিন্তু যান অন্য আর এক দিন এবং তাও স্থির করেন হঠাৎ।"

মহারাজ বললেন, "তোরা কি মনে করিস্, আমি নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করি? আমার যাবার দিন স্থির করার জন্য ভক্তেরা পীড়াপীড়ি

১ গীতা, ৩।২৫-২৬

২ Our wills are ours, we know not how,
Our wills are ours to make them thine. (Tennyson)

করে, অবিরত বিরক্তি এড়ানোর জন্য তাই আমি মোটামুটি একটা দিন স্থির করি, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা না জানা পর্যন্ত আমি নড়ি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কি সকল সময় ঠাকুরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা মহারাজ, আমিও হয়তো ভাবি বা মনে করি যে, ভগবানের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তখন নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করছি, আর সেই ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিচ্ছি ভগবানের উপর। আপনি কি সেরূপ করেন না?"

"না বাবা, এটা সেরূপ নয়।"

"তা হ'লে কি আপনি বলছেন যে, আপনি ঈশ্বরকে দেখতে পান, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁর ইচ্ছা কি জানতে পারেন?"

"হাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ইচ্ছা আমি জানতে না পারি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আমাকে না বলেন আমি কি করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি।"

"আপনি যা করেন, সবই কি তাই?"

"হাঁ, আমি যা করি, তার প্রত্যেকটির জন্য তাঁর নিকট থেকে নির্দেশ পাই।"

"তিনি যাকে শিষ্য করতে বলেছেন, তাকেই কি শিষ্য করেছেন?"

"হাঁ।"

এই কথাবার্তার পর তাঁর অদ্ভুত আচরণের কারণ আরও ভালভাবে বুঝতে পারলাম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখনই আমরা কোন বিষয়ে তাঁর নিকট উপদেশ চাইতাম, তখন তিনি বলতেন, "অপেক্ষা কর্; এখন আমার মাথা ঠিক কাজ করছে না।" অথবা বলতেন, "আমি কাল ব'লব।" কখনও কখনও এমন অনেক 'কাল' পার হয়ে যেত, কিন্তু

শিষ্য সঠিক উত্তর পেতেন না। কিন্তু মহারাজ শেষ পর্যন্ত যখন কথা বলতেন, তখন সে কথার ভিতর এক বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত।

যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি ॥ ৬ ॥

যে প্রেম লাভ করিলে ভক্ত প্রথমে আনন্দে পাগলের ন্যায় হন, পরে ঈশ্বরের উপলব্ধি হইলে জড়বৎ হন এবং আত্মার আনন্দে বিভোর হন।

এই সূত্র ব্যাখ্যা করার পূর্বে দু-একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। পূর্ণ মানবের বাহ্য আচরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন মান নেই। লোকে সাধুর কার্যকলাপ ও আচরণ সম্পর্কে নিজেদের মন-গড়া একটা মান স্থির করে ও সেই মানদণ্ড দিয়ে সাধু-পুরুষকে বিচার করে। সাধু বা সন্ন্যাসী প্রচলিত প্রথার বন্ধনে আবদ্ধ নন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ—তাঁরা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান বা ইহুদী যে ধর্মমতের লোকই হোন না কেন—চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে তাঁদের অন্তরের উপলব্ধি একরূপ। তাঁরা নিজ নিজ অন্তরে একইরূপ আনন্দ ও মাধুর্য উপলব্ধি করেন। বাহ্যতঃ তাঁহাদিগকে নিজ নিজ দৈনন্দিন কর্তব্যকর্মরত সাধারণ মানুষের মতো দেখায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন: কখনও তিনি পাঁচ বছরের বালকের ন্যায় আচরণ করেন, কখনও বা তাঁকে দেখে মনে হয় মাতাল বা পাগল। অথবা তাঁকে দেখা যায় জড়বৎ স্তব্ধ ও গতিহীন। তিনি কোন আইনকানুনের অধীন নন; তবে তিনি এমন কোন কাজ করেন না যা অসাধু বা অনৈতিক। ফুলের সৌরভের মতো স্বার্থহীন হবার চেষ্টা না করেও তাঁর কার্যকলাপ ও অভিপ্রায় স্বার্থহীন।

আমি দেখেছি, একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিরূপ 'বজ্রের চেয়েও কঠোর' হ'তে পারেন, যদিও তাঁর অন্তরপ্রকৃতি 'কুসুমের চেয়েও কোমল'।

আমার গুরুদেব মাঝে মাঝে আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করতেন। তথাপি আমি হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্বদা জানতাম যে, তিনি আমাকে ভালবাসেন বলেই আমার দোষত্রুটি সংশোধন করছেন। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "শিশুকে কোলে নিয়ে মা তাকে চড় মারে, কিন্তু শিশু কেঁদে কেঁদে ডাকে 'মা, মা'।"

'যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি'—যে প্রেম লাভ করলে ভক্ত আনন্দে মাতালের মতো হন। রামপ্রসাদের একটি গানে আছে, "সুরা পান করিনে আমি সুধা খাই জয় কালী ব'লে। মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি শ্লোকে প্রতীক ব্যবহার দ্বারা আধ্যাত্মিক মত্ততার ধারণা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

"ব্রহ্মলোকে একটি সরোবর আছে, যার জল অমৃতের মতো ; কেউ সেই জল পান করলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে মত্ত হয়ে যান ; সেই সরোবরের তীরে আছে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ , ঐ বৃক্ষ অমরত্বের রস প্রদান করে।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী শিবানন্দ আমাদের একদিন বলেছিলেন, "খুব ভোরে উঠে প্রাণভরে ধ্যান জপ করবে। তাহ'লে তোমাদের মন উচ্চস্তরে উঠবে। আমি নিজে সকালে ধ্যান করি, সারাদিন যেন নেশার ঘোরে কেটে যায়।"

এ সম্বন্ধে স্বামী ব্রহ্মানন্দের এক শিষ্যের স্বর্গীয় মত্ততা সম্পর্কিত একটি বর্ণনা এখানে দেওয়া হ'ল। পুরীতে জগন্নাথ-মন্দির দর্শনকালে তিনি এরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সর্বদা অনুভব করেন যে, এরূপ উপলব্ধি একমাত্র গুরুকৃপা এবং ভগবৎ কৃপাতেই সম্ভব।

তাঁর নিজের কথাতেই বলছি : "আমার এক গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে একবার তীর্থযাত্রায় জগন্নাথ-মন্দিরে গিয়েছিলাম। একজন পুরোহিত

১ ছান্দোগ্য, ৮।৫।৩

হয়েছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। গর্ভ-মন্দিরে ঢুকতে হ'লে বিরাট মন্দিরের বেদীর বামদিকে একটি গলি-পথ দিয়ে যেতে হয়। গলিতে ঢুকবার মুখে হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো এক শব্দ শুনতে পেলাম। (আমি এখানে স্বীকার করছি যে, হৃদয়ে কোন শ্রদ্ধা-ভক্তি নিয়ে আমি বেদীর নিকট যাইনি।) বজ্র আমাকে আঘাত করা মাত্র মুহূর্তের জন্য আমি খুব ভীত হলাম। কিন্তু ভীত হয়ে থাকবার সময় পাইনি, কারণ আমি জ্ঞান হারালাম। আমি খুব অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম যে, আমার গুরুভাই পুরোহিতকে আমার বাম হাত ধরতে বলছেন। তিনি নিজে আমার ডান হাত ধরেছিলেন। তাঁরা আমার দু-হাত ধরেছিলেন, কিন্তু আমি জানতে পারিনি যে কেউ আমাকে ধরে আছেন। আমার অল্প কিছু জ্ঞান নিশ্চয়ই ছিল, আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি—আমি কে বা আমি কোথায় আছি। আমার মনে হ'ল আমার নেশা হয়েছে, বোতলের পর বোতল মদ খেলে যেরূপ নেশা হয়, সেইরূপ নেশা। আমার মনে পড়ে, পা টেনে টেনে আমি হাঁটছিলাম। তারপর সেই পবিত্র বেদীর আরও নিকটবর্তী হলাম, আমার ভিতর থেকে বের হ'ল ইংরেজী শব্দ: 'God, God, God', যদিও আমার মাতৃভাষা বাংলা। আমার সারা দেহ শিউরে উঠল। গর্ভ-মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'ল। আমার শুধু এই বোধ ছিল যে, হঠাৎ-প্রকাশিত এক দর্শন আমি উপলব্ধি করছি—জানি না আমার চোখ খোলা ছিল, না বন্ধ ছিল।

"মন্দির ও চারদিকের প্রাচীর, সেখানে সমবেত যাত্রিগণ বা মন্দিরেব দেবদেবীর বিগ্রহ কিছুই আমি দেখতে পাইনি; দেখেছিলাম শুধু এক আলোর সমুদ্র, আর স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ এসে আমাকে আঘাত করছে, সে আনন্দ গভীর থেকে গভীরতব হচ্ছে; সে আনন্দ ভাষায় বর্ণনা কবা সম্ভব নয়।

"মন্দিরের ভিতর কতক্ষণ ছিলাম জানি না। তবে আমার মনে আছে, মন্দিরের বাইরে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আমাকে আনা হয়েছিল; আমার হাত ধরে রাখা হয়েছে ব'লে বোধ হ'ল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করলাম।

"অনেকদিন পরে আমার গুরুভাইকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমি যে জ্ঞান হারাতে যাচ্ছিলাম, সে কথা কি-ভাবে আপনি জানতে পারেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি যে অনেক দিন মহারাজের নিকট বাস করেছি, তাই জানি'।"

বাস্তবিক, মহারাজ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য শিষ্যগণ কতবার যে ভগবৎ-প্রেমে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, তা গণনা করা সম্ভব নয়। তাঁদের আমরা প্রায়ই প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে-কোন দেবদেবীর নাম মুখে আনলেই ভাবাবিষ্ট হতেন। শ্রীশ্রীকালী-মন্দিরে যাবার সময় ও ফিরে আসার সময় তিনি ভাবে এমন বিভোর হতেন যে, তাঁকে ধরবার জন্য একজন শিষ্যকে তাঁর নিকট থাকতে হ'ত। অপরিচিত একজন লোক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপ অবস্থা দেখে একদিন বলেছিল, 'লোকটা মাতাল হয়েছে।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়:

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের নাম করতে করতে দাঁড়ালেন ও সমাধিমগ্ন হলেন। মন কিছু নীচে নামলে তিনি নাচতে নাচতে গান ধরলেন—

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে (মা,)
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূল-মন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা, (মা)
রামপ্রসাদ বলে, এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥

হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের নাম-গান করাকে ঈশ্বরের নামসুধা-পান করা বলে।

পৃথিবীর সকল ধর্মের অতীন্দ্রিয়বাদিগণের জীবনেও অনুরূপ ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততার উপলব্ধি দেখা যায়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা পড়ি: ধ্যানাভ্যাস দ্বারা তোমার ভিতরের 'আমি'টাকে অগ্নিসাৎ কর। ভগবৎ-প্রেমরসে মত্ত হও, তাহলে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হবে।[১]

'জ্ঞাত্বা' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে, উপলব্ধি হ'লে; কারণ পরম প্রিয় ঈশ্বর আমার হৃদয়-মন্দিরে চিরকাল বিরাজিত আছেন। অন্য বস্তুকে যেমন আমরা বাইরে থেকে পাই, তাঁকে সেভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তঃস্থিত ভগবদ্-রাজ্য প্রকাশিত হয়।

তিনি জড়বৎ হন। এখানে সমাধি-অবস্থার কথা বলা হয়েছে। সমাধি হচ্ছে অদ্বৈতজ্ঞান-উপলব্ধি। ইহা চেতনার শ্রেষ্ঠ স্তর, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—চেতনার সাধারণ এই তিনটি স্তর অতিক্রম করলে এই চেতনার উপলব্ধি হয়। বর্তমান যুগে এ বিষয়ে যাঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একমাত্র ব্যক্তি যিনি দিনের মধ্যে বহুবার সমাধিমগ্ন হতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের লেখক 'শ্রীম' যিনি স্বচক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অবস্থা দেখেছেন, তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি:

" ঠাকুর অদ্ভুত ভাবে ভাবিত হলেন ····তিনি সেই বালক রাখালকে বাৎসল্য-ভাবে দেখিতে লাগিলেন ও 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া যশোদার যে ভাবের উদয় হইত, এ বুঝি সেই ভাব। ভক্তেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, এমন সময় সব স্থির। 'গোবিন্দ' নাম করিতে করিতে

১ শ্বেতাশ্বতর, ১।১১

ভক্তাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি হইযাছে। শরীর চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির। ইন্দ্রিয়গণ কাজে জবাব দিয়া যেন চলিয়া গিযাছে। নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির। নিঃশ্বাস বহিছে কি না বহিছে।"

কথাবার্তার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন : ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে যায।

আচার্য শঙ্কর বলেছেন : এই নিস্তব্ধতার অবস্থাই হচ্ছে পূর্ণ শান্তির অবস্থা। এমন অবস্থায় বুদ্ধি আর নিজেকে অনিত্য বস্তুর সঙ্গে যুক্ত রাখে না। এই মৌন অবস্থায জ্ঞানী মহাত্মা ব্রহ্মের সহিত একত্ব অনুভব ক'রে চিরকাল অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করেন।

তিনি ··"আত্মারামো ভবতি" · আত্মাব আনন্দে বিভোর হন।

ব্রহ্মসত্য উপলব্ধি করাব পর স্বাভাবিক চেতন-ভূমিতে নেমে এলে দেবমানবের কি অবস্থা হয়, সে-বিষয়ে এতে বলা হয়েছে।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কি অবস্থায় বাস করেন, সে সম্বন্ধে শঙ্কর 'বিবেক-চূড়ামণি'তে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন :

ব্রহ্ম-সমুদ্র আত্মানন্দরূপ অমৃতে পূর্ণ। যে-ধন আমি পেলাম, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, মন তা ধারণা করতে পারে না। একখণ্ড শিলার মতো আমার মন ব্রহ্ম-সমুদ্রে এক সুবৃহৎ বিস্তৃত স্থানে পতিত হ'ল। এক ফোঁটা অমৃতের স্পর্শে দ্রবীভূত হযে আমি ব্রহ্মের সহিত একাত্ম হলাম। যদিও আমি এখন মানবিক চেতনার স্তরে ফিরে এসেছি, তবু আমি ব্রহ্মানন্দেই বাস করছি।[১]

১ বিবেকচূড়ামণি, ৫৮২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্যাগ ও শরণাগতি

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥

ভক্তি সকল প্রকার বাসনার প্রতিবন্ধকস্বরূপ, তাই বাসনা-পূরণের জন্য ভক্তিকে ব্যবহার করা চলে না।

এখানে ভক্তির অর্থ, ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ ও গভীর প্রেম। চিত্ত-আকর্ষণকারী প্রিয়তম ভগবানের প্রতি ভক্ত-হৃদয়ে যখন প্রেমের উদয় হয়, তখন জাগতিক কোন বস্তু বা কোন আনন্দ লাভের বাসনা তাঁর হৃদয়ে আর অবশিষ্ট থাকে না। ঈশ্বর-দর্শনের পর ঈশ্বরের মধ্যেই ভক্তের সকল বাসনার পূরণ হয়। বিশুদ্ধ নির্মল জলপূর্ণ বিরাট নদীর তীরে বসে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কেউ কূপ খনন করে না।

দেবমানবের আনন্দ বর্ণনা-প্রসঙ্গে শঙ্কর উল্লেখ করেছেন: 'অহং' লুপ্ত হয়েছে; ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করেছি, তাই আমার সকল বাসনা বিলীন হয়েছে। সকল প্রকার অজ্ঞতা ও বাহ্য জগতের সব রকম জ্ঞানের ঊর্ধ্বে আমি উঠেছি। আমি যে-আনন্দ অনুভব করছি, সে-আনন্দ কী? কে তার পরিমাপ করবে? আমি আনন্দ ছাড়া কিছু জানি না—অসীম, অনন্ত আনন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের বয়স যখন কম ছিল, যখন তিনি 'নরেন' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁর জীবনের সেই সময়ের একটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করছি। ভক্তি যে জাগতিক সকল প্রকার বাসনার প্রতিবন্ধক, তার এক চিত্র এতে পাওয়া যাবে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নরেনের পিতা

বিশ্বনাথের হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়; কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর রেখে-যাওয়া সম্পত্তি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল যে, তিনি রেখে গেছেন শুধু ঋণ; কারণ, তাঁর আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী। নরেন নূতন উদ্যমে চাকরির অন্বেষণে ব্যাপৃত হলেন। একজন এটর্নির অফিসে একটি কাজ পেলেন, কিছু পুস্তক অনুবাদের কাজ—সবই সাময়িক। এতে মা ও ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা যায় না। নরেন স্থির করলেন যে, তিনি তাঁর পরিবারের আর্থিক দুর্গতি দূর করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাতে অনুরোধ করবেন। নরেন সেইরূপ অনুরোধ করায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "নরেন, তোকেই প্রার্থনা করতে হবে। নিঃসঙ্কোচে জগন্মাতার অস্তিত্ব স্বীকার কর্ ও সাহায্যের জন্য প্রার্থনা কর্।" তিনি আরও বললেন, "আজ মঙ্গলবার, জগন্মাতার নিকট এটি একটি বিশেষ পবিত্র দিন, আজ রাত্রে মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা কর্। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তুই মায়ের নিকট যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবেন।"

রাত্রি ন-টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনকে মন্দিরে পাঠালেন। মন্দিরে যাবার পথে তিনি কি-রকম যেন নেশাগ্রস্ত হলেন—ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। মন্দিরে ঢুকেই দেখতে পেলেন চিন্ময়ী জগন্মাতাকে। বিহ্বল হয়ে বেদীর সম্মুখে বার বার সাষ্টাঙ্গ হয়ে মাকে প্রণাম ক'রে বলতে লাগলেন, "মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও! আর আশীর্বাদ কর যেন বিনা বাধায় সর্বদা তোমাকে দেখতে পাই।" তাঁর হৃদয় শান্তিপূর্ণ হ'ল। তাঁর বাহ্য জগতের চেতনা লুপ্ত হ'ল। থাকলেন শুধু—মা।

মন্দির থেকে ফিরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরিবারবর্গের দুর্দশা মোচনের জন্য প্রার্থনা করেছিস?' নরেন হতবাক্ হলেন, তিনি সে-কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনকে ঐ প্রার্থনা জানাতে তাড়াতাড়ি আবার মন্দিরে যেতে বললেন।

নরেন আদেশ পালন করলেন। কিন্তু পুনরায় তিনি আনন্দে তন্ময় হলেন। তাঁর মনের বাসনার কথা ভুলে গিয়ে বিবেক, বৈরাগ্য ও জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করলেন। তিনি ফিরে এসে সব কথা জানালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "বোকা ছেলে! তুই নিজেকে একটু সংযত ক'রে প্রার্থনার কথা মনে রাখতে পারলি না? আবার ফিরে যা, মাকে বল্, তুই কি চাস্—তাড়াতাড়ি যা।" এবার নরেনের অভিজ্ঞতা হ'ল ভিন্নরূপ। প্রার্থনার কথা তিনি ভোলেন নি, কিন্তু তৃতীয় বার মন্দিরে উপস্থিত হয়ে তিনি গভীর লজ্জা অনুভব করলেন। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যা চাইতে এসেছেন তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। পরে তিনি বলেছিলেন, "সেটা ছিল ঠিক যেন রাজার নিকট সাদর অভ্যর্থনা পাবার পর তাঁর নিকট লাউ-কুমড়ো পাবার প্রার্থনা করার মতো।" সেজন্য সেবারও তিনি প্রার্থনা করলেন—ত্যাগ, ভক্তি ও জ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেনের পরিবারবর্গকে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন, "তাদের কোন দিন মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।"

এরূপ ঘটনার অভিজ্ঞতা প্রত্যেক আধ্যাত্মিক-উন্নতিকামী ব্যক্তিরই হয়। তিনি যত ঈশ্বরের সমীপবর্তী হন, তত তাঁর হৃদয় প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হয় এবং সেখানে আর অন্য কোন বাসনার স্থান থাকে না। রামপ্রসাদের একটি গানে আছে যে, মহামায়ার কৃপা লাভ করলে দেবরাজ ইন্দ্রের পদও তুচ্ছ মনে হয়।

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

নিরোধ বা ত্যাগ কথার অর্থ, লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার কর্ম ঈশ্বরে উৎসর্গীকরণ।

'ত্যাগ' কথাটি শুনলে মনে হয় যেন একটা ভয়ানক ব্যাপার। প্রকৃত-পক্ষে ত্যাগের অর্থ হচ্ছে—বড়র বদলে ছোট কিছু ত্যাগ। যেমন, আইস-

ক্রীমের বদলে মিষ্ট দুধ ত্যাগ ; পরিবর্তে আরও ভাল কিছু পাওয়া যায়। এক সাধু ও রাজার একটি গল্প আছে। রাজা সাধুর নিকট এসে বললেন, "আপনার এত বড় ত্যাগ, আপনি একজন মহাত্মা।" সাধু উত্তর দিলেন, "ত্যাগে তুমি আমার চেয়েও বড়। দেখ, আমি অসীম সনাতন বস্তুর জন্য ত্যাগ করেছি সীমাবদ্ধ নগণ্য ক্ষণস্থায়ী বস্তু। আর তুমি অনিত্য বস্তুর জন্য ত্যাগ করেছ নিত্য বস্তু। তাই তোমার ত্যাগ আমার ত্যাগ অপেক্ষা বড়।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ত্যাগের আদর্শ স্বাভাবিকভাবে বাড়ে। জোর ক'রে ত্যাগ করা উচিত নয়।" তিনি একটি দৃষ্টান্ত দেন : ঘা সম্পূর্ণ সারবার পূর্বে যদি কেউ তার মামড়ি ছাড়ায়, তাহ'লে ঘা আরও বেড়ে যায়। মামড়িটা শুকনো হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর, তখন সেটা নিজ থেকেই খসে পড়বে। তেমনি ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাও, শুদ্ধাভক্তির জন্য প্রার্থনা কর ; ঈশ্বরকে ভালবাসতে শেখ ; এই ভালবাসা তোমার হৃদয়ে ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং তোমার সকল বাসনা স্বাভাবিকভাবে সংযত হবে। সংসারের প্রতি তোমার আসক্তিরও অবসান হবে। অনুসরণ করবার পথ হিসাবে ভক্তিপথই তাই সব চেয়ে স্বাভাবিক ও সরল পথ। কারণ, যত বেশী ঈশ্বরকে চিন্তা করা যায় তত বেশী হৃদয়ে প্রেম বাড়ে এবং প্রেম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধক স্বাভাবিকভাবে লাভ করে বিবেক, বৈরাগ্য ও শুদ্ধ অন্তঃকরণ।

উপমা দিয়ে বলা যায়, ঈশ্বর যেন একটি বড় চুম্বক এবং আমাদের রিপু ও সাংসারিক ভোগ-সুখ প্রভৃতি যেন ছোট ছোট চুম্বক। যখন এই সব ছোট ছোট চুম্বক আমাদের টানে, তখন বড় চুম্বকের আকর্ষণ আমরা অনুভব করতে পারি না। কারণ, মনের ভিতর অনেক ধুলো কাদা জমে আছে। কিন্তু আমরা যদি ঈশ্বরকে চাই, তাঁর জন্য কাঁদি, আমাদের মনের ধুলো-কাদা ধুয়ে যায় ও ভগবৎ-কৃপারূপে আমরা ঈশ্বরের সেই বড় চুম্বকের আকর্ষণ অনুভব করি।

পূর্ণ মানবের বাসনা-কামনা কিছুই নেই। সাংসারিক ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি সজ্ঞানে ও সজাগ অবস্থায় চলেন ফেরেন, তাঁর সত্তা ঈশ্বরময় হয়।

ত্যাগের অর্থ এই নয় যে, সকল কর্ম বর্জন করতে হবে। দেবমানবের ঐহিক অথবা আধ্যাত্মিক সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। তাঁর কর্ম ভগবৎ-পূজায় পরিণত হয়। সংসারে বাস করলেও তিনি সংসারের কেউ নন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন, "নৌকাকে জলের উপর থাকতে দাও, কিন্তু জলকে নৌকার ভিতর থাকতে দিও না।"

ভগবদ্গীতায় উক্ত হয়েছে :

"কর্মত্যাগদ্বারা নৈষ্কর্ম্য লাভ করা যায় না। কর্মে বিরত থেকে কেউ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কেউ ক্ষণিকের জন্যও কর্ম না ক'রে থাকতে পারে না। (এখানে কর্মের অর্থ—চেতন ও অবচেতন মনের কর্ম।) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবে সকলে অসহায় হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হয়।"[১]

"যে ব্যক্তি শারীরিক সকল প্রকার কর্ম ত্যাগ ক'রেও মনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-বস্তুর বাসনা পোষণ করে, সেই ব্যক্তি আত্ম-প্রবঞ্চনা করে। তাকে মিথ্যাচারী বলা হয়। যিনি ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করেন, তিনি প্রকৃতই প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁর সকল কর্মই অনাসক্ত। তাঁর সকল কর্ম পরিচালিত হয় ব্রহ্মের সহিত যোগ-সাধনের পথে।"[২]

"ভগবৎ-পূজার জন্য কর্ম অনুষ্ঠিত না হ'লে জগতের সকল কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব ফলপ্রাপ্তির আসক্তি ত্যাগ ক'রে ভগবানের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম কর।"[৩]

১ গীতা, ৩।৪-৫'

২ গীতা, ৩।৬-৭

৩ গীতা, ৩।৯

নিজ নিজ কর্মদ্বারা ভগবৎ-পূজার গোপন রহস্য শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন :

"হে কৌন্তেয়! তোমার সকল কর্ম, আহার, পূজা, দান, তপস্যা—সবই আমাকে সমর্পণ কর।"[১]

শঙ্কর কর্মের গোপন রহস্য অনুধাবন ক'রে বলেছেন, "হে প্রভু! আমি যা করি, সবই তোমার পূজা।"

'আমি কর্তা' এই বোধই সাংসারিকতা। পার্থিব বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি আসক্তি হচ্ছে এই বোধ যে, আমি ঐ-সব বস্তু বা ব্যক্তির অধিকারী ও তারা 'আমার'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই বলতেন, "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।"

পূর্ণ মানব সকল প্রকার 'অহং'-ভাব-মুক্ত এবং তিনি ঈশ্বরের পাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক তাঁর সহিত যুক্ত হয়েছেন।

আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তির উচিত—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন ও কর্ম অনুকরণের চেষ্টা করা। ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনই যে তাঁর লক্ষ্য, এ কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে বিশ্বাসের অনুশীলন—এই বিশ্বাস যে, দূর ভবিষ্যতে নয়, যে কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগস্থাপন সম্ভব। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ধৈর্য। প্রকৃত আধ্যাত্মিক-উন্নতিকামীর দুটি বৈশিষ্ট্য—ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

তস্মিন্নন্যতা তদ্‌বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

ভক্তের ত্যাগের অর্থ, ভক্তের সর্বান্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী করা এবং ভগবৎ-প্রেমের প্রতিবন্ধক বিষয় ও বস্তু পরিহার করা।

'তস্মিন্নন্যতা'—ভক্তের সর্বান্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী করা, অর্থাৎ ভক্ত সর্বতোভাবে তাঁর ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত হন। মানুষ যত দিন বাঁচে, রিপুগণও

১ গীতা, ৯.২৭

তত দিন তার সঙ্গে থাকে। ভক্তের রিপু উচ্চস্তরে উন্নীত হয় অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের অভিমুখে চালিত হয়। এখানে অবদমন হয় না।

যখন সর্বান্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তখন আরও কিছু ঘটে। এরূপ ভক্তের জীবন সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হয়। ঈশ্বর প্রেমময়। সেই প্রেম অহেতুক। ভক্ত যত ঈশ্বরচিন্তা করেন ও আধ্যাত্মিক জীবনের নিয়মাবলী পালন করেন, তত তিনি উপলব্ধি করেন সর্ব জীবের প্রতি অহেতুক এবং অবাধ প্রেম, যদিও সেই সব জীবের অনেক দুর্বলতা ও মনুষ্যসুলভ দোষ ত্রুটি আছে। ঈশ্বরপ্রেমদ্বারাই ভক্ত ঈশ্বরের সেই প্রেমের আস্বাদ ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সর্বত্র ও সর্বজীবে তিনি ইষ্টমূর্তির দর্শনলাভ করেন, ও সর্ব-জীবের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরের সেবায় দিন যাপন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের সঙ্গে পরিচয় লাভের পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন ভগবৎ-প্রেমের মূর্ত প্রতীক। আমাদের প্রতি অহেতুক ভালবাসার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি খুব আকৃষ্ট হতাম। তাঁদের দেবার মতো আমাদের কিছুই ছিল না, তবু আমাদের পিতা-মাতা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে যা পাই, তার চেয়ে বেশী ভালবাসা আমরা তাঁদের নিকট থেকে পেয়েছিলাম।

তা ছাড়া ঈশ্বরকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসলে ভক্ত অহমিকা-মুক্ত হন। তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত এক হয়ে যায়। অবশ্য লোকশিক্ষার জন্য তাঁকে কিছু অহং-ভাব রাখতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "এটা 'বিদ্যার আমি'। এতে কোন ক্ষতি হয় না।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, ব্রহ্ম হ'তে পৃথক্ যে 'আমি', সেই 'আমি'-ভাব থেকে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপর এক শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ আমাকে বলেছিলেন, "স্বামীজী যখন 'আমি' কথাটি ব্যবহার করতেন, তখন তাঁর 'আমি' হ'ত সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সহিত একীভূত।"

তস্মিন্নন্যতা, তদ্ বিরোধিষূদাসীনতা চ—ভক্তের ত্যাগের অর্থ ভক্তের সর্ব অন্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখী করা এবং ভগবৎ-প্রেমের প্রতিবন্ধক বিষয় ও বস্তু পরিহার করা। (পাঠকের সুবিধার জন্য সূত্রটি পুনরায় উল্লেখ করা হ'ল, কারণ পরবর্তী দুটি সূত্রে এ বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।)

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগঃ অনন্যতা ॥ ১০ ॥

ঐকান্তিক ভক্তির অর্থ—অন্য সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করা।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, "যদি কয়েকজন মাত্র লোক বেরিয়ে এসে বলেন, 'ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কিছু নাই', তাহ'লে তাঁরা পৃথিবীকে পরিবর্তিত করতে পারেন।"

লোকে নিরাপত্তা চায়, কিন্তু কিভাবে কোথায় সে নিরাপত্তা পেতে পারে? সংসারের যা কিছু দেবার আছে, হয়তো সে-সব অনেকে পেয়েছে, তবু তারা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে। আমরা মনে করতে পারি যে, ধন ও ঐশ্বর্য অথবা নাম-যশ বা পার্থিব আনন্দের বস্তু আমাদের সুখী করে ও নিরাপত্তা দেয়; কিন্তু সব শেষে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা ঐ সব পেয়েও নিরাপদ নই, এবং নৈরাশ্য অনুভব করি। নিরাপত্তা পাওয়া যায় একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যে, যিনি আমাদের অন্তরতম সত্তা। অন্য সবকিছু আমাদের নিরাশ করে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের কখনও নিরাশ করেন না। আমাদের নিতে হবে একমাত্র তাঁরই আশ্রয়।

আধ্যাত্মিক কর্মের অনুশীলনদ্বারা যখন আমরা সতত ঈশ্বরের স্মরণ-মননে প্রতিষ্ঠিত হই, যখন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি—'তিনি আমাদের চরম লক্ষ্য, আমাদের

দয়িত, প্রভু, অন্তর্যামী, তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ আবাস, প্রকৃত শরণ ও প্রকৃত বন্ধু।'

সর্বতোভাবে মন ঈশ্বরাভিমুখী হ'লে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ভক্ত উপলব্ধি করেন যে, তাঁর একমাত্র বল ঈশ্বর, একমাত্র ধন ঈশ্বর এবং একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুরক্ত শিষ্য স্বামী সদানন্দ একমাত্র স্বামীজীরই শরণ নিয়েছিলেন। কারণ, এই শিষ্যের নিকট তাঁর গুরুদেব স্বামীজীই ছিলেন ভগবান্। তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন এবং কারও সাহায্য ছাড়া নড়া-চড়া করতে পারতেন না। তাঁর প্রতি অনুরক্ত দুই ভাই তাঁর যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করতেন। একদিন তাঁদের মনে হ'ল যে, তাঁদের সেবা-যত্ন ছাড়া মহারাজ একেবারে অসহায়। স্বামী সদানন্দ তাঁদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, "দেখ, আমি নিজে নড়তে পারি না বটে, তবে তোরা আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আয়, দেখবি স্বামীজী এসে আদর ক'রে আমার সেবা-যত্ন করছেন।" একেই বলে প্রকৃত বিশ্বাস। এটাই হ'ল—'ঈশ্বর আমার একমাত্র আশ্রয়'-কথাটির অর্থ।

লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা ॥ ১১ ॥

ভগবৎ-প্রেমের প্রতিবন্ধক কর্মসমূহ পরিহার করা, অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তির অনুকূল সাংসারিক ও পবিত্র কর্মসমূহের অনুষ্ঠান।

প্রকৃত ভক্ত এমন কোন কাজ করেন না, যাতে ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কি কাজ ভাল, আর কি কাজ মন্দ? কোন্‌টি ন্যায়, আর কোন্‌টি অন্যায়?—এ বিষয় বিচারের জন্য একটা নীতি আছে: যে-কাজ সাধকের মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখতে ও ঈশ্বরকে স্মরণ-মনন করতে সাহায্য করে, তা ভাল ও ন্যায় কাজ; আর যে-কাজ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, ঈশ্বর থেকে সাধককে দূরে সরিয়ে দেয়, তা মন্দ বা অন্যায় কাজ।

এই প্রসঙ্গে অমৃতত্বের রহস্য সম্বন্ধে বালক নচিকেতাকে যম যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কঠ-উপনিষদে আছে :

"শ্রেয় এক বস্তু, প্রেয় অন্য বস্তু ; উভয়ে কর্মে প্রেরণা দেয়, কিন্তু ফলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। যিনি শ্রেয় পছন্দ করেন, তিনি ভাগ্যবান্। প্রেয় পছন্দ করলে লক্ষ্যবস্তু হাতছাড়া হয়। শ্রেয় ও প্রেয় উভয় বস্তু মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে পরীক্ষা করেন, একের সহিত অন্যের পার্থক্য বুঝতে পারেন। তিনি শ্রেয়কে আপাতরমণীয় অপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন, মূর্খ দৈহিক কামনা-তাড়িত হয়ে শ্রেয় অপেক্ষা রমণীয়কে বেশী পছন্দ করে।"[১]

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

আধ্যাত্মিক জীবন ঈশ্বরে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রবাক্য মানিয়া চলিতে হইবে।

তীব্র ভগবৎ-প্রেম লাভ না করা পর্যন্ত ভক্তের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত। কারণ, আধ্যাত্মিক উন্নতিকামীর নিকট এগুলি প্রত্যাদিষ্ট সত্য এবং পথ-প্রদর্শক। আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করতে হ'লে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা হ'ল—গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন :

"যিনি শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘনপূর্বক বাসনার তাড়নায় কর্ম করেন, তিনি সিদ্ধি, সুখ ও মোক্ষ লাভ করতে পারেন না।

"কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই তোমার পথপ্রদর্শক হোক্। প্রথমে কর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত পথ কি তা শিক্ষা করবে, তারপর সেই মতো কর্ম করবে।"[২]

১ কঠ ১।২।২
২ গীতা, ১৬।২৩-২৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশপূর্ণ একটি ছোট গল্প থেকে জানা যায় যে, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত শাস্ত্রবাক্য মেনে চলা উচিত। একজন বাড়ী থেকে এক চিঠি পেল, তাতে লেখা আছে বাড়ী যাবার সময় কি কি জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে। চিঠিটি হারিয়ে যাওয়ায় লোকটি খুব উদ্বিগ্ন হ'ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে চিঠিটি পেল এবং জিনিসগুলি কিনল। তারপর সে চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলে দিল। এখন আর তার সে চিঠির প্রয়োজন নেই। সেইরূপ ভক্তের পক্ষেও—যতক্ষণ পর্যন্ত না লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলা উচিত। তারপর শাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ বিষয়ে আরও একটি দৃষ্টান্ত দিতেন, "যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন:

"দেশ জলপ্লাবিত হ'লে যেমন জলাধারের আর প্রয়োজন থাকে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বেদের কোন প্রয়োজন নেই।"[১]

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥ ১৩ ॥

অন্যথা করিলে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে।

ভগবদ্ভাবে ও সতত ভগবৎ-স্মরণ-মননে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বে যদি কেউ শাস্ত্র- ও গুরু-নির্দেশিত শিক্ষা অবহেলা করেন, তাহ'লে ইন্দ্রিয়-সুখ ও বৈষয়িক আসক্তির বিগত সংস্কারদ্বারা তাঁর বিপন্ন হবার আশঙ্কা থাকে ও তিনি ভগবৎ-সংযোগপথ থেকে পতিত হন।

১ গীতা, ২।৪৬

লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি ॥১৪॥

লৌকিক কর্ম করা ততদিন প্রয়োজন, যতদিন না ভক্তি পাকা হয়। কিন্তু দেহরক্ষার জন্য সকল কর্ম—যথা পান-ভোজনাদি করিতে হয়।

সামাজিক বা লৌকিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিব মধ্যে তা বিভিন্ন রকম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বিভিন্ন দেশের লোক বিভিন্ন বকম পোশাক পরে। যতদিন ঈশ্বরেব প্রতি তীব্র প্রেম হৃদয়ে উদিত না হয়, ততদিন পযন্ত এই সকল সামাজিক রীতি-নীতি মামুলি হলেও পালন করতে হয়। শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা আছে, "যখন যেমন, তখন তেমন; যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যাকে যেমন, তাকে তেমন।" এবং সেণ্ট এম্ব্রোজের কথায়, "রোমে থাকলে রোমের প্রথা-মত বাস কর।"[১] একজন দেবমানব বাহ্য আচার-আচরণ ভুলে যেতে পারেন, তিনি যে ঠিকভাবে ঐগুলি পালন করবেন, তা আশা করা যায় না।

তবু দেবমানব দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পানাহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ও জৈব কাজ-কর্ম অবহেলা করেন না। তিনি মনে করেন, দেহ ও মন তাঁর নিজের নয়, সেগুলি ঈশ্বরের—যিনি তাঁর অন্তর্যামী আত্মা।

১ When you are in Rome, live in the Roman style.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তির লক্ষণ

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ ॥ ১৫ ॥

বিভিন্ন মতানুসারে মুনিগণকর্তৃক বিভিন্নভাবে ভক্তির লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি সূত্রে ঈশ্বরের প্রতি পরমা ভক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী কয়েকটি সূত্রে নারদ অন্য মহান্ মুনি-ঋষিগণ কর্তৃক প্রদত্ত ভক্তির সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন। ভক্তির এই সব সংজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি পরমা ভক্তি লাভের উপায় ও পথ প্রদর্শন করেছে ব'লে দেখা যায়। যদিও মনে হয়, এই-সব সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা নয়। নারদ এগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছেন ভক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ দেবার জন্য এবং শেষ করেছেন ঐ সংজ্ঞাগুলিকে নিজের দেওয়া সংজ্ঞার সহিত মিলিত ক'রে।

ব্রহ্ম কি বস্তু, তা মুখে বলা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন-নি।"—অর্থাৎ মুখে সে কথা বলা যায় না। তিনি আরও বলেছেন, "বেদ ও অন্য সব শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট হয়েছে। কারণ, ঐগুলি লোকে উচ্চারণ করেছে, মুখে বলেছে।" সেই পরম সত্য ব্রহ্মকে কেবল উপলব্ধি করা যায়। দেবমানব যখন ব্রহ্ম উপলব্ধি করেন, তখন তিনি একেবারে আকণ্ঠ ভরপুর হয়ে যান। তাঁর মুখে আর বাক্য সরে না।

তবু আমরা দেখি যে, মুনি-ঋষিগণ প্রেম-সুধাপানে মত্ত হয়ে চরম সত্যকে ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁদের ভাষা বিভিন্ন।

কারণ, তাঁরা কেবল ব্রহ্মের মাত্র এক দিকের বিষয় প্রকাশ করতে পারেন। কেবল আপেক্ষিক সত্যই প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু পূর্ণ সত্য কখনও প্রকাশ করা যায় না। এমন কি খ্রীষ্ট, বুদ্ধ এবং রামকৃষ্ণ আপেক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেদের প্রকাশ করেছেন। সেজন্য কখনও কখনও প্রকাশভঙ্গিতে তারতম্য ঘটলেও সেগুলি পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোন লোক সূর্যের একটি ফটোগ্রাফ নিতে চায়। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে একটি ছবি তুললে, তারপর সূর্যের আরও নিকটে গিয়ে আর একটি ছবি তুললে; এইরূপে সূর্যের আরও এবং আরও নিকটে যেতে যেতে বিভিন্ন দূরত্ব থেকে সূর্যের ছবি তুললে। তারপর ছবিগুলি মেলাতে গিয়ে দেখা যায়, তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল নেই। তা সত্ত্বেও কিন্তু সেগুলি একই সূর্যের ছবি। "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।"—সৎ বস্তু এক, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাঁকে বিভিন্ন নামে বিশেষিত করেন।

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ ॥ ১৬ ॥

পরাশর-পুত্র ব্যাস ভক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন—পূজাদি ও তদনুরূপ কর্মের প্রতি অনুরাগ।

ব্যাস ছিলেন বেদ ও পুরাণের সুপরিচিত সংকলক। ভক্তির সংজ্ঞায় তিনি জোর দিয়েছেন পূজাদি কর্মের উপর। এই সব কর্ম ঈশ্বরের সহিত মনের যোগ স্থাপন করে।

ফল, ফুল, জল, দীপ, ধূপ প্রভৃতি নিবেদনসহ আনুষ্ঠানিক কর্মাদি পূজার অন্তর্ভুক্ত। জপসহ মানস-পূজাও এর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল পূজা-অনুষ্ঠান ঈশ্বরের সহিত মনের যোগ স্থাপন করে।

এ বিষয়ে আমার গুরুদেব আমাকে যে-কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ

করছি। একদিন আমি মহারাজের ঘরে এক সাজি ফুল সাজাচ্ছিলাম। মহারাজ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্দিরে ফুল নিবেদন করেছি কি না। উত্তর দিলাম "না"। আমি ভেবেছিলাম, মন্দিরে আছে শুধু একটি ছবি। তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কি মনে করিস্, মন্দিরে শুধু ছবি আছে?" আমি ভীত হয়ে উত্তর দিলাম, "হাঁ"। তিনি তখন জানতে চাইলেন যে, বাহ্য আনুষ্ঠানিক পূজা আমি কখনও করেছি কি না। আমি উত্তর দিলাম, "ও সবে আমার বিশ্বাস নেই, তাই করি না।" আনুষ্ঠানিক পূজার কার্যকারিতা বোঝাবার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন না। শুধু বললেন, "তোকে আমি পূজা করতে বলছি!" তাঁকে বললাম, "আপনার কথামত ক'রব।" তারপর আমি পূজা-অনুষ্ঠান আরম্ভ করলাম, এবং মাত্র তিন দিন পরে গীতায় প্রদত্ত শিক্ষার সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস জন্মাল :

"যে ভক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল অর্পণ করে, আমি তার ভক্তি-অর্ঘ্য প্রীতির সহিত গ্রহণ করি।"[১]

আমি স্বীকার করছি যে, আমি প্রকৃত ভক্তি সহকারে পূজা করি-নি, করেছিলাম যান্ত্রিকভাবে, তবু আমার গুরুদেব ও প্রভু তাঁদের রহস্যময় কৃপায় আমার বিশ্বাস উৎপাদন করেছিলেন যে, প্রভু আমার উপহার গ্রহণ করেছেন।

আমার গুরুদেব যে তাঁর প্রত্যেক শিষ্যকে পূজা করতে বলতেন, তা নয়, শিষ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিতেন।

ভক্তের হৃদয় ও মন ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত করতে আনুষ্ঠানিক পূজা বিশেষ সহায়ক। হিন্দুদের পূজাপদ্ধতি শিক্ষা করলে ভক্তিদ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব-উপলব্ধি-শিক্ষার একটি ব্যাবহারিক উপায় জানা যায়। কথায় আছে, 'দেবতা হয়ে দেবতার পূজা কর।' এটা হ'ল বাহ্য পূজানুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত

১ গীতা, ৯।২৬

মূল তত্ত্ব। অনেকে পূজা-অনুষ্ঠানকে ভুল বোঝেন ; তাঁরা মনে করেন, এর সঙ্গে দ্বৈতবাদের সম্বন্ধ আছে। প্রকৃত পক্ষে এর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে অদ্বৈতবাদের। কারণ, পূজক শুধু আনুষ্ঠানিক কর্মই করেন না, সেই সঙ্গে তিনি ব্রহ্মের সহিত তাঁর একাত্মতা বিষয়ে ধ্যান করবার চেষ্টা করেন।

সত্য বটে, পূজকের ইষ্ট কোন দেবদেবী বা অবতারের ছবি বা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পূজক বাহ্যতঃ নিবেদন করেন ফুল ও অন্যান্য দ্রব্য ; কিন্তু প্রথমেই তিনি ধ্যান করেন ব্রহ্মের সহিত তাঁর সংযোগের বিষয়। তারপর তিনি ধ্যান করেন তাঁর হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত আত্মা ব্রহ্মরূপ ইষ্টদেবকে। তারপর তাঁর ইষ্টদেবকে হৃদয় থেকে বাইরে এনে স্থাপন কবেন তাঁর সম্মুখে এবং চিন্তা করেন যে, ঐ ছবি বা বিগ্রহ যেন চিন্ময়। তারপর তিনি ইষ্টমূর্তিকে নিবেদন করেন ফুল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, এবং ঐ সঙ্গে চিন্তা করেন যে, প্রত্যেকটি দ্রব্যেই অধিষ্ঠিত আছেন সেই একই ইষ্টদেবতা —সেই একই ব্রহ্ম। এ যেন 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা'। পূজা শেষ কবার পূর্বে গুরুদত্ত মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণপূর্বক নির্দিষ্টসংখ্যক জপ কবতে হয়। হিন্দু-ঐতিহ্য অনুসারে গুরুর নিকট মন্ত্রদীক্ষা না পেলে কেউ আনুষ্ঠানিক পূজাদির অধিকারী হয় না।

অনেকের ধারণা আছে যে, আনুষ্ঠানিক পূজা কেবল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন ; কিন্তু এই ধারণা ভুল। প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে আনুষ্ঠানিক পূজা খুব সহায়ক—এ-কথা পূর্বে বলা হয়েছে ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, এমন দেবমানবগণও আনুষ্ঠানিক পূজা ক'রে থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরও শঙ্কর, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা করতেন।

বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনার কথা তাঁর এক শিষ্য স্বামী বোধানন্দ বর্ণনা করেছেন, তিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সম্মুখে স্বামীজী আসীন, পার্শ্বে সচন্দন পুষ্পপাত্র।

তিনি শিষ্যগণকে ধ্যান করতে আদেশ দিলেন। কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর স্বামীজী পুষ্পপাত্র নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, প্রত্যেক শিষ্যের মাথার উপর অর্ঘ্যরূপে এক-একটি ফুল স্থাপন ক'রে একে একে সকল শিষ্যের পূজা করলেন। সকল শিষ্যকে পূজা করা শেষ হ'লে পুষ্পপাত্রের অবশিষ্ট ফুল দিয়ে পূজা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবিকে।

মানসপূজাও 'পূজা'র অন্তর্ভুক্ত। ফুল বা পূজার অন্যান্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন নেই। ফুল বা অন্যান্য দ্রব্যাদি যা সাধকের মনে পড়ে, সে-সব দিয়ে সাধক মনে মনে ইষ্টদেবকে পূজা করেন।

এক সাধুর একটি গল্প আছে। অন্য সাধুরা যখন ধ্যান করতেন, তখন তিনি তাঁদের নিকট যেতেন। একদিন তিনি এক সাধুর নিকট গেছেন, সেই সময় সাধুটির ধ্যান ভঙ্গ হ'ল। আগন্তুক সাধু ঐ সাধুকে বললেন, "ওহো, আপনি প্রভুর জন্য জুতোর দোকানে কি জুতো কিনছিলেন?" সাধুটি মৃদু হাস্য ক'রে বললেন, "হাঁ, এ-কথা সত্য।" এই গল্পটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়। ধ্যান করার সময় যদি সাধকের চিত্তবিক্ষেপ ঘটে, চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয়-বস্তুর সঙ্গে ইষ্টের সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে সেগুলিকে ইষ্ট-চিন্তার সহায়করূপে ব্যবহার করতে হবে। কথায় বলে, "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।"—যে কোন উপায়ে পারো মনকে কৃষ্ণচিন্তায় নিযুক্ত রাখো।

এই সূত্রে ভক্তির সংজ্ঞায় আমরা পাই—'পূজাদি ও অনুরূপ কর্মের প্রতি অনুরাগ।' অনুরূপ শব্দটির উল্লেখে বুঝায় মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা। এটাও একপ্রকার পূজা।

কথাদিষু ইতি গর্গঃ ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি গর্গের মতে ভক্তির সংজ্ঞা—ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও কীর্তনেব প্রতি অনুরাগ।

শ্রীচৈতন্যদেব-রচিত সুপ্রসিদ্ধ 'শিক্ষাষ্টকে' আছে :

অবিরাম ভগবানের নাম-গুণগান কীর্তন কর, তোমার হৃদয়-দর্পণ মুছে পরিষ্কার হবে। বিষয়-তৃষ্ণারূপ যে দারুণ দাবানল তোমার অন্তরে জ্বলছে, তাও নির্বাপিত হবে।

প্রত্যেক ধর্মে ভগবানের নামগুণ-কীর্তনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মহান্ সাধক রামপ্রসাদ তাঁর ইষ্টদেবী শ্রীশ্রীকালীমাতার নাম-গুণগান ক'রে ঈশ্বরের সহিত তাঁর সংযোগের বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন। চিত্তাকর্ষক তাঁর জীবনী। তিনি একটি জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখবার ভার ছিল তাঁর উপর। কিন্তু হিসাবেব খাতায় হিসাব না লিখে পাতার পর পাতা ভরতি করেছিলেন শ্যামাসঙ্গীত লিখে। এই সব সঙ্গীত তিনি অফিসের কাজের সময় রচনা করেন। একদিন মালিক এলেন খাতা পরীক্ষা করতে। মালিক রাগ করলেন না; ভক্তিমূলক সঙ্গীত-রচনায় রামপ্রসাদের প্রতিভা উপলব্ধি ক'রে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি রামপ্রসাদকে বললেন, "দেখ, তুমি বাড়ী যাও। এখানকার কাজের জন্য তুমি যে বেতন পাও, আমি নিয়মিতভাবে তোমাকে সেই বেতন দেবো। তাহ'লে তোমাকে জীবন-ধারণের জন্য কাজ করতে হবে না। ভক্তিমূলক সঙ্গীত রচনা কর ও গান কর।"

এই সূত্র আরও নির্দেশ করে—শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনা এবং ভগবানের নাম-গুণকীর্তন ও স্তব-রচনা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ করি: "অদ্ভুত এই শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ, অদ্ভুত তাঁর কার্যাবলী। এমন কি তাঁর নাম উচ্চারণ করলে, যিনি উচ্চারণ করেন ও যিনি শোনেন তাঁরা উভয়ে পবিত্র হন।"[১]

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করলে এমন একটা সময় আসে যখন ঈশ্বরীয়

১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১২।৩।৪৪

কথা বই অন্য কথা বলা ভক্তের পক্ষে সম্ভব হয় না। বৈষয়িক আলোচনা শুনতে পেলে তিনি সে-স্থান ত্যাগ করেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: মন ও ইন্দ্রিয় আমাতে সমাহিত ক'রে তাঁরা পরস্পরের মধ্যে সর্বদা আমার বিষয়ই আলোচনা করেন। এইভাবে তাঁরা পরস্পরকে আনন্দ দানপূর্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন।[১]

আত্মরত্যবিরোধেন ইতি শাণ্ডিল্যঃ ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি শাণ্ডিল্য চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তা ত্যাগ এবং আত্মাতে প্রীতিলাভ করাকে 'ভক্তি' সংজ্ঞা দিয়াছেন।

হৃদয়ে ভক্তির উদয় হ'লে ভক্ত সকল প্রকার চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তা থেকে মুক্ত হন। কারণ, তিনি আত্মার চিন্তায় অধিক আনন্দ পান। তাঁর হৃদয়-মন্দিরে যে ঈশ্বর লুকিয়ে বাস করেন, তিনিই আত্মা। অন্য কথায় শাণ্ডিল্যের মতে আত্মাতে আনন্দ ও শান্তিলাভই প্রকৃত ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সাধনাবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন: "দেখ, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান্ যেন সমুদ্রের জলের মতো সব জায়গা পূর্ণ ক'রে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি। ঠিক ধ্যান হ'লে এইটি সত্যসত্যই দেখবে। আবার কখনও কখনও মনে হ'ত আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাইরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছে।···

"কখনও বলি—তুমিই আমি, আমিই তুমি, আবার কখনও কখনও 'তুমিই তুমি' হয়ে যায়, তখন আর 'আমি' খুঁজে পাই না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সময় শ্রীশ্রীমার মনে হয়েছিল,

১ গীতা, ১০।৯

তিনি যেন কানায় কানায় পূর্ণ একটি কুম্ভ। তাঁর হৃদয় ঈশ্বরীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্ বিস্মরণে
পরমব্যাকুলতেতি ॥ ১৯ ॥

নারদের মতে ভক্তির লক্ষণ—যখন সকল চিন্তা, সকল কথা ও সকল কর্ম ইষ্টপদে সমর্পণ করা হয়, যখন ক্ষণেকের জন্য ইষ্টকে ভুলিলে অবস্থা শোচনীয় হয়, তখন ভক্তির সঞ্চার হয়।

বিভিন্ন ঋষি-প্রদত্ত ভক্তির সংজ্ঞাগুলি উদ্ধৃত ক'রে নারদ এই সূত্রে সেই সংজ্ঞাগুলির সারসংক্ষেপ করেছেন। নারদ জোর দিয়ে সংক্ষেপে বলেছেন, পূর্ণ আত্মসমর্পণই হ'ল ভক্তি। এই আত্মসমর্পণের আদর্শেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনোচিত সকল প্রকার কর্ম।

আত্মসমর্পণের অর্থ হচ্ছে সতত ইষ্ট-স্মরণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ঈশ্বরকে খুঁজো না, তাঁকে দেখ।"—ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান। ঈশ্বর-চিন্তা করা মাত্র নিজ মনকে বিশ্বাস করাও যে, তুমি সত্যই ঈশ্বরের সমক্ষে রয়েছ। তাঁকে পাবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ কর এবং তার নিকট প্রার্থনা জানাও যে, তিনি যেন তোমার নিকট প্রকাশিত হন। এটি ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে প্রায়ই বলতেন, "হৃদয়ে তীব্র যাতনা নিয়ে ব্যাকুলভাবে দিনরাত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমাকে ভক্তি দেন।"

সংগীত-রচয়িতা বলেছেন, "সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায় আমি প্রার্থনা ক'রব ও উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে ডাকব; তিনি আমার ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পাবেন।"[১]

১ Psalm 55 : 17

সেণ্ট ল্যুকের সুসমাচারে আমরা পাঠ করি, "তিনি তাঁদের নিকট শিক্ষামূলক গল্প বলেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে সকল লোক সর্বদা প্রার্থনা করে।"

সেণ্ট পল বলেছেন, "অবিরাম প্রার্থনা কর।"

যখন সাধক ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি 'অবিরাম প্রার্থনা করেন।' অর্থাৎ তখন তাঁর সকল কর্ম ও সকল চিন্তা ঈশ্বরে সমর্পিত হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

"তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর। তুমি সর্বদা আমার উপাসনা কর, আমার পূজা কর ও আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, তুমি আমাকে পাবে।

"সকল কর্তব্য কর্ম আমাতে অর্পণ ক'রে আমার শরণাগত হও। তোমার কোন ভয় বা চিন্তা নেই। আমি তোমাকে সকল পাপ ও বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রব।[১]

আত্মসমর্পণের আর একটি অর্থ হচ্ছে, 'ক্ষণেকের জন্য ইষ্টকে ভুলে গেলে অবস্থা শোচনীয় হয়।'

শ্রীচৈতন্যদেবের একটি প্রার্থনায় আছে : "হে গোবিন্দ, সে-দিন কবে হবে, যে-দিন তোমার বিচ্ছেদে একটি মুহূর্তকে মনে হবে এক যুগ, যে-দিন তোমার অভাবে জগৎ শূন্য বোধ হবে।"[২]

অন্ত্যেবমেবম্ ॥ ২০ ॥

ভক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশের দৃষ্টান্ত আছে।

প্রকৃত প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনাকালে নারদ খুব জোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, যে-ভক্তির দ্বারা ভক্ত ঈশ্বরে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, সে-ভক্তি

১ গীতা, ১৮।৬৫, ৬৬

২ যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে। —শিক্ষাষ্টকম্

শুধু একটা তাত্ত্বিক আদর্শ নয়। দৃষ্টান্ত-স্থাপনকারী ঐরূপ ভক্ত স্ত্রী ও পুরুষ দুইই আছেন। পরবর্তী শ্লোকে নারদ বৃন্দাবনের গোপীদের কৃষ্ণ-প্রেমের উদাহরণ দিয়েছেন। হয়তো কেউ বলবেন, ও তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ঐরূপ বহু ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং ঐরূপ ভক্ত এ-যুগেও আছেন। আমাব জীবনে, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েক জন শিষ্যের জীবনে আমি প্রত্যক্ষ করেছি এই দৃষ্টান্ত। স্বর্গীয় প্রেমানন্দে তাঁরা ডুবে থাকতেন ও আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন, শুদ্ধা-ভক্তি লাভের জন্য প্রার্থনা করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যগণকে বলতেন, "খুব ব্যাকুল হযে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন। তিন টান এক হ'লে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও একসঙ্গে হয, সেই টানের জোরে সে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"

গভীর আধ্যাত্মিক সাধনাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি-ভাবে প্রার্থনা করতেন, সে কথা তিনি তাঁর শিষ্যগণকে বলেছিলেন: "মা! এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও. এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

নারদ উদাহরণ দিচ্ছেন:

যথা ব্রজগোপিকানাম্ ॥ ২১ ॥

যেমন ব্রজগোপীগণের হইয়াছিল।

এতে ব্রজগোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী লীলার প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রেম স্বভাবতঃ স্বর্গীয়। প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন একে চালিত করা হয় ঈশ্বরের দিকে। আবার এর প্রকাশভঙ্গীও নানা রূপ। (পরবর্তী সূত্রগুলিতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।) শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা সন্তানের ন্যায় ভালবাসতেন, রাখাল বালকগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন প্রিয় সখা ও খেলার সাথী এবং ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি ছিলেন প্রেমিক ও সাথী।

পতঙ্গ যেমন দীপশিখার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনলে গোপীগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁরা সব ভুলে যেতেন, এমন কি তাঁদের দেহজ্ঞানও লুপ্ত হ'ত। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের টানে তাঁরা তাঁর নিকট ছুটে যেতেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা পাঠ করি :

ব্রজগোপীগণ ধন্য! তাঁরা সতত স্মরণ করেন শ্রীকৃষ্ণকে। তাঁদের চিত্ত সর্বদা কৃষ্ণময়; এমন কি তাঁরা যখন গাভী দোহন করেন, দধি মন্থন করেন, ঘর-দোর পরিষ্কার করেন বা সাংসারিক অপর সকল কাজ করেন, সকল সময়ে তাঁদের হৃদয় কৃষ্ণময় থাকে। প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁবা তখন শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করেন।[১]

গোপীদেব বিষয় কিছু শুনতে পেলে অথবা কৃষ্ণের প্রতি তাঁদেব গভীর ভালবাসার কথা চিন্তা করলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই সমাধিমগ্ন হতেন।

শ্রীবামকৃষ্ণ গোপীদের সম্বন্ধে বলেছেন : বাঘ যেমন অন্য পশুকে গিলে খায়, ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম ও আগ্রহ তেমনই গিলে খায় কাম ক্রোধ ও অন্য সব রিপুকে। গোপীদের ভক্তি প্রেমের ভক্তি—বিশ্বস্ত, নির্ভেজাল ও অদম্য।

কৃষ্ণ নিজে আনন্দময়, তিনি সকলকে আনন্দ দান কবতেন, যত জন গোপ-বালিকা, তিনি নিজেকে যেন ভাগ ক'রে তত জন কৃষ্ণ হতেন

১। শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০।৪৪।১৫

এবং তাঁদের সঙ্গে লীলা-খেলা করতেন। প্রত্যেক বালিকা শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি ও স্বর্গীয় প্রেম অনুভব করতেন। প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, তিনি খুব ভাগ্যবতী। কৃষ্ণের প্রতি প্রত্যেকের ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সহিত একাত্মতা অনুভব করতেন; শুধু তাই নয়, প্রত্যেকেই মনে করতেন যে, তিনিই কৃষ্ণ। যে-দিকে দৃষ্টিপাত করতেন সর্বত্র কৃষ্ণ দর্শন করতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন :

"গোপী-লীলা প্রেম-ধর্মের পরাকাষ্ঠা; এখানে ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে, পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে সংযোগ। 'আমার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর' শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষা তিনি গোপী-লীলায় প্রদর্শন করেছেন। যদি ভক্তি বুঝতে চাও তো বৃন্দাবন-লীলার আশ্রয় গ্রহণ কর।

"আহা! সম্পূর্ণ পবিত্র ও শুদ্ধ না হ'লে কারও পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা বুঝতে পারা কঠিন—প্রেমের সেই পরম বিস্ময়কর প্রসারণ রূপকাত্মকভাবে বৃন্দাবন-লীলায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমসুধাপানে মাতোয়ারা না হ'লে তা কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। আদর্শ প্রেমিকা গোপবালাগণের প্রেমের নিদারুণ যন্ত্রণা কে কল্পনা করতে পারে? সে-প্রেম কিছুই চায় না, সে-প্রেম স্বর্গও গ্রাহ্য করে না, গ্রাহ্য করে না ইহজগতের বা পরজগতের কোন বস্তু।

"যে ঐতিহাসিক গোপীগণের বিস্ময়কর এই প্রেমের কথা বিবৃত করেছেন, তিনি হলেন ব্যাস-পুত্র শুকদেব, যিনি জন্মাবধি পবিত্র ও নিত্য শুদ্ধ। যতদিন হৃদয়ে স্বার্থপরতা থাকবে ততদিন ভগবৎ-প্রেম লাভ করা অসম্ভব, এটা দোকানদারী করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

"আহা! ঐ ওষ্ঠাধরের একবার একটি মাত্র চুম্বন! যে তোমার চুম্বন লাভ করেছে, তোমার জন্য তার ব্যাকুলতাও চিরদিন বাড়তে থাকে, সকল দুঃখের অবসান হয়, অন্য সব কিছুর প্রতি ভালবাসা সে ভুলে যায়,

সে চায় তোমাকে, কেবল তোমাকে।···হাঁ, প্রথমে ত্যাগ কর কাঞ্চন, নাম যশ ও পৃথিবীর অসার বস্তুর প্রতি আসক্তি। তারপর, কেবল তারপরই বুঝতে পারবে গোপীদের প্রেম কি বস্তু! এ প্রেম এত ঐশ্বরিক যে, সর্বস্ব ত্যাগ না করলে তাকে পাবার চেষ্টা করা যায় না; এ প্রেম এত পবিত্র যে, শুদ্ধাত্মা না হ'লে কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কামিনী, কাঞ্চন, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা যার হৃদয়ে প্রতি মুহূর্তে উদিত হচ্ছে, কোন্ সাহসে সে গোপীপ্রেমের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা করে?

"···এখানেই আছে আনন্দের অত্যধিক উল্লাস, প্রেমের উন্মাদনা, যেখানে গুরু, শিষ্য, উপদেশ, পুস্তক, এমন কি ভীতির ধারণা এবং ঈশ্বর ও স্বর্গ সব একাকার। অন্য সব কিছু দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বাকী শুধু প্রেমের পাগল-করা গভীর আবেগ। সব কিছু একেবারে ভুলে গিয়ে প্রেমিক কৃষ্ণ, শুধু কৃষ্ণ ছাড়া এ জগতের অন্য কিছু দেখতে পায় না, সব জীবের মুখমণ্ডল, তার নিজের মুখমণ্ডলও কৃষ্ণের মতো দেখায়; তাঁর আত্মাও রঞ্জিত হয়েছে কৃষ্ণ-রঙে।"

ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২ ॥

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে প্রেমিকরূপে পূজা করিলেও তিনি যে স্বয়ং ভগবান্—এ কথা ভুলিয়া যান নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ করি, এক দিন কৃষ্ণ তাঁর প্রতি গোপীদের ভক্তি পরীক্ষা করবার জন্য তাঁদের বললেন, 'ওগো পবিত্রহৃদয়াগণ, তোমাদের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত তোমাদের স্বামী ও সন্তানদের সেবা। বাড়ী ফিরে যাও এবং তাদের সেবায় দিন যাপন কর। আমার নিকট আসবার প্রয়োজন নেই; কারণ, আমাকে কেবল ধ্যান করলেই তোমাদের মুক্তি হবে।" কিন্তু ব্রজগোপীগণ উত্তর দিলেন,—"ওহে নিঠুর

প্রেমিক, আমরা কেবল তোমাকেই সেবা করতে চাই। শাস্ত্রীয় সত্য সব জেনেও তুমি আমাদের পরামর্শ দিচ্ছ স্বামী ও সন্তানদের সেবা করতে। তবে তাই হোক, তোমার কথা-মতই কাজ ক'রব। যেহেতু তুমি সব কিছু এবং জীবজগতের আধার, তোমার সেবাদ্বারাই আমরা তাদেরও সেবা ক'রব।"

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও পাঠ করি, গোপীগণ কৃষ্ণকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন, "তুমি তো শুধু যশোদার দুলাল নও, তুমি সকল জীবের অন্তরতম আত্মা।"

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণকে তাঁদের একমাত্র দয়িতরূপে ভালবেসে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মতা, চেতনার সর্বোত্তম অবস্থা লাভ করেছিলেন।

ভদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩ ॥
নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্ ॥ ২৪ ॥

যদি 'কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্' এই জ্ঞান তাঁহাদের না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রেম ভ্রষ্টা নারীদের উপপতির প্রতি আসক্তির সমান বলিয়া গণ্য হইত।

প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হওয়া নয়, কামে শুধু আত্মসুখের বাসনা থাকে।

প্রেমের প্রকৃতি স্বর্গীয়; ঈশ্বরের অভিমুখে চালিত হ'লে সে-প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। 'ইমিটেশন অব্ ক্রাইষ্ট' পুস্তকে টমাস আ কেম্পিস খ্রীষ্টকে দিয়ে এই কথাগুলি বলিয়েছেন:

তোমার বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা আমার উপর ভিত্তি ক'রে স্থাপন করা উচিত; সে যেই হোক, সে যে তোমার প্রেমাস্পদ, তা আমারই জন্য

আমাকে ছাড়া সে প্রেমের শক্তি ও স্থায়িত্ব নেই ; আমার সহিত সংযুক্ত না হ'লে সে-প্রেম সত্য ও শুদ্ধ হয় না।

জীবের প্রতি প্রেম যদি ঈশ্বরের উপর ভিত্তি ক'রে স্থাপিত না হয়, তা হ'লে সেই প্রেমের সহিত ভগবৎ-প্রেমের বিরাট পার্থক্য ঘটে। ভ্রষ্টা নারীর উপপতির প্রতি ভালবাসার অপর নাম 'কাম'। কামের প্রধান উপাদান আত্মসুখ লাভ। এর অপর নাম 'মোহ'।

স্বর্গীয় প্রেমে দেহবুদ্ধির সম্পূর্ণ বিস্মরণ ঘটে, স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে না এবং প্রেমাস্পদে মন নিমগ্ন হয়। প্রেমাস্পদকে সুখী করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়। সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্যতাই ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মানব-জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্য

সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥ ২৫ ॥

কর্ম, জ্ঞান ও যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর।

নারদ এই সূত্রে ও পরবর্তী আটটি সূত্রে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, অন্য তিনটি পথ—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং রাজযোগ—অপেক্ষা পরাভক্তি মহত্তর। এতে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হ'তে পারে। মনে হ'তে পারে, নারদ ছিলেন একদেশদর্শী, তিনি ভক্তি-পথকে অন্য তিনটি পথ অপেক্ষা বেশী পছন্দ করতেন। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যায় যে, নারদ ভক্তি-পথকে সে-ভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি উল্লেখ করেছেন শেষ পরিণতির বিষয়—পরাভক্তির ফলস্বরূপ ব্রহ্মসংযোগ।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তির দুটি অর্থ—উপলব্ধ লক্ষ্য এবং ঐ লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ। পরে ঐ পথে কি-ভাবে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, সে-বিষয়ে নারদ ব্যাখ্যা করবেন।

এই পুস্তকের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, ভগবান্-লাভের চারটি পথ আছে—ভক্তির, জ্ঞানের, কর্মের এবং ধ্যানের পথ। এই চারটি পথকে নিশ্ছিদ্র কক্ষের ন্যায় পরস্পর থেকে পৃথক্ করা যায় না। ভগবদ্গীতায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীতে একদেশদর্শী না হয়ে নিজ জীবনে এই চারটি যোগের মিলন ঘটাবার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ অপর তিনটিকে বাদ দিয়ে মাত্র একটি পথ অনুসরণ করতে কেউ পারে না, ভক্ত কেবল যে-কোন একটির উপর গুরুত্ব দিতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভক্ত যে-কোন পথই অনুসরণ করুন না কেন, সাধনার অঙ্গ হিসাবে তাঁকে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়; তা ছাড়া সাধককে সদসৎ বিচার করতে হয় এবং কর্মতৎপরও হতে হয়। এ-সব ছাড়াও সাধকের থাকা প্রয়োজন আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং আগ্রহ বা ভালবাসা। তাই প্রকৃতপক্ষে সাধকের জীবনে সব কয়টি যোগেরই মিলন ঘটে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ভক্তিপথের সাধক এবং জ্ঞান-পথের সাধক উভয়েই শেষ পর্যন্ত একরূপ ফল লাভ করেন। পূর্ণজ্ঞান ও পরাভক্তি এক হয়ে যায়।

তবু জ্ঞানপথের সাধক ও ভক্তিপথের সাধকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। জ্ঞানপথের সাধক সাধনার আরম্ভ থেকে ব্রহ্মের সহিত অদ্বৈত-ভাবে ধ্যান করেন এবং ভক্তিপথের সাধক আরম্ভ করেন দ্বৈতভাবে।

কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে, জ্ঞানপথের সাধক ব্রহ্মের সহিত একত্বের বিষয় ধ্যান করলেও ঐ পথেও আছে দ্বৈতভাব—ধ্যানকারী ও ধ্যানের বিষয়বস্তুর মধ্যে।

ভক্ত সাধনা আরম্ভ করেন দ্বৈতবাদী-রূপে; সাধারণ নিয়ম অনুসারে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম মিলন চান না। তাঁর একমাত্র বাসনা ও প্রবল ইচ্ছা, ঈশ্বরের দর্শনলাভ ও তাঁর সঙ্গে আলাপনের আনন্দ উপভোগ।

একদিন আমি আমার গুরুদেবের পদতলে বসে আছি, এমন সময় একজন ভক্ত নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভক্তদের একটি গানে আছে 'চিনি হ'তে চাই না আমি, চিনি খেতে ভালবাসি।' ভক্তের মনোভাব কি ঐরূপ হওয়া প্রয়োজন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "যারা এখনও চিনি খায়-নি, তাদের জন্য 'চিনি খেতে চাই, চিনি হ'তে চাই না।' ভক্ত যখন ঈশ্বরের মাধুর্যের স্বাদ পেতে আরম্ভ করে, তখন সে চায় ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ করতে।"

এই পরম প্রেমের উদয় হ'লে প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এক হয়ে যায়। ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব জ্ঞান জন্মায়। পরম প্রেম ও পূর্ণজ্ঞান একবস্তু।

জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন জ্ঞাতা, জ্ঞেয় (ব্রহ্ম) এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য-বোধ। ঈশ্বরকে জানার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর কর্ম (কারক) ও জ্ঞাতা কর্তা। ইমানুয়েল ক্যাণ্ট বলেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সামান্যতম সীমারেখা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই বস্তুর স্বরূপ অজ্ঞানাই থাকে। বহু শতাব্দী পূর্বে শঙ্কর নির্দেশ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানের কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে সামান্যতম বিচ্ছেদ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরকে জানা যায় না। কিন্তু তিনি বলেছেন যে, পরিশেষে আধ্যাত্মিক সাধক এই উভয়-সংকটের ঊর্ধ্বে ওঠেন; তিনি একে বলেছেন 'ত্রিপুটি ভেদ' বা তিনটি গ্রন্থির উন্মোচন ও একাত্মবোধক চেতনা লাভ।[১]

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের গুণ নয়। যিনি সৎ, তিনিই চিৎ, আবার তিনিই আনন্দ। সৎ, চিৎ ও আনন্দ প্রত্যেকটিই ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। জ্ঞানের পথে জোর দেওয়া হয়েছে চিৎ বা শুদ্ধ চৈতন্যের উপর, এবং ভক্তির পথে জোর দেওয়া হয়েছে আনন্দের উপর। সাধক যখন শেষ পরিণতি লাভ করেন তখন চিৎ ও আনন্দের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। তখন পরম প্রেম এবং ব্রহ্মের সহিত একত্ব-জ্ঞান এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

ভগবদ্গীতায় আমরা পাঠ করি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করবার জন্য তাঁর সখা ও শিষ্য অর্জুনকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন:

তুমি আমার যে-রূপ দেখলে এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ, তপস্যা, দান বা

---

১ এইরূপে জ্ঞানী সর্বোচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করেন, তখন কর্তা ও কর্মবোধ বিলুপ্ত হয়, থাকে কেবল একাত্মবোধক চেতনা এবং তখন তিনি এ জগতে বাস করেও নির্বাণের আনন্দ লাভ করেন। (শঙ্কর)

যজ্ঞপূজাদির দ্বারা দর্শন করা যায় না। কিন্তু অনন্যা ভক্তিদ্বারাই আমাব এই প্রকার রূপ জানতে, প্রত্যক্ষ করতে ও আমাতে প্রবেশ ক'রে মোক্ষলাভ করতে ভক্তগণ সমর্থ হন।[১]

কেন নারদকর্তৃক ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে বিবেচিত হয ?

ফলরূপত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

কেন না, ভক্তি আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ পরিণতি ও লক্ষ্য। অন্য পথগুলি মানুষকে উপলব্ধির দিকে চালিত কবে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান এক ও অভিন্ন। সেই জন্য যে-পরাভক্তি ব্রহ্মের সহিত একত্ব জ্ঞান দান কবে, সেই পরাভক্তি উপলব্ধি করা সকল প্রকার আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্য ও ফল ব'লে বিবেচিত হয।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন :

"আমাকে ভক্তি করলে আমার স্বরূপ, আমার অন্তরতম প্রকৃতি জানা যায। এই তত্ত্ব জানা মাত্র ভক্ত আমাতে প্রবেশ করেন।

"ভক্ত তাঁর সকল কর্ম সর্বদা আমাতে সমর্পণ করলে আমাব অনুগ্রহে সনাতন অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হন।"[২]

ঈশ্বরস্যাপি অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ চ ॥ ২৭ ॥

অহমিকার প্রতি ঈশ্বরের দ্বেষ এবং দীনতার প্রতি তাঁব প্রীতি থাকাব জন্য ভক্তি সর্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়।

'অহমিকার প্রতি ঈশ্বরের দ্বেষ' এই কথার অর্থ, যতক্ষণ আমাদের আমিত্ববোধ ও অহংকার থাকে, ততক্ষণ ঈশ্বর আমাদের ভিতর লুকিযে

১ গীতা, ১১।৫৩-৫৪

২ গীতা, ১৮।৫৫-৫৬

থাকেন (ধরা দেন না)। পরাভক্তি লাভ ক'রে দেবমানব আমিত্ব বোধকে অতিক্রম করেন।

একটি উপনিষদে আমরা পাঠ করি, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ 'নাতিবাদী' হন অর্থাৎ নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য জোর করেন না।

আমার গুরুদেব আমাকে প্রায়ই আবৃত্তি ক'রে শোনাতেন শ্রীচৈতন্য-দেবের একটি প্রার্থনা :

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—তৃণ অপেক্ষা বিনয়ী হও, বৃক্ষের চেয়ে সহিষ্ণু হও, নিরভিমান হয়ে অপরকে সম্মান দাও এবং সর্বদা হরিনাম কীর্তন কর।

সঙ্গীতাবলীতে আমরা পড়ি, "যার নজর উঁচু ও হৃদয় গর্বিত, তাকে আমি সহ্য ক'রব না।"[১]

বাইবেলে একটি প্রবাদ আছে, যার অর্থ: "যে ব্যক্তির হৃদয়ে অহংকার আছে, সে প্রভুর নিকট ঘৃণার পাত্র।"[২]

পিটার বলেছেন, "ঈশ্বর অহংকারীকে বাধা দেন ও বিনয়ীকে অনুগ্রহ করেন।"[৩]

শ্রীকৃষ্ণ আসুরিক প্রবৃত্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেন, "আত্মাভিমানী, উদ্ধত, বৃথা দম্ভকারী, ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণ···অহংকার, গর্ব ও ক্রোধে পূর্ণ হয়।···আমি তাদের জন্ম ও মৃত্যুর আবর্তে ঘুরতে বাধ্য করি এবং বার বার নীচ যোনিতে নিক্ষেপ করি।"[৪]

১ Him that hath an high look and a proud heart, will not I suffer.—Psalms

২ Every one that is proud in heart is an abomination to the Lord.—Proverbs

৩ God resisteth the proud and giveth grace to the humble.

৪ গীতা ১৬।১৭-১৯

যা হোক, এর অর্থ এই নয় যে, তারা চিরকালের জন্য হারিয়ে যায় বা ঈশ্বর তাদের কৃপা থেকে বঞ্চিত করেন। বহুজন্মব্যাপী দুঃখ ভোগ করতে করতে পরিশেষে তারা সদসৎ বিচার করতে শেখে ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়। 'আমি', 'আমার' এই বোধ তাদের অন্ধ ক'রে রাখে। এ কথা সত্য যে, সুখ ও দুঃখ এই দুই-এর অনুভূতি মহান্ শিক্ষক, কিন্তু দুঃখ মহত্তর শিক্ষক। কারণ মানুষ যখন খুব দুর্দশাগ্রস্ত হয়, দুর্দশামোচনের কোন উপায় খুঁজে পায় না, তখন সে ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরায় এবং বোঝে—ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয়।

ঈশ্বর কারও প্রতি পক্ষপাত করেন না বা কাকেও তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত করেন না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলতেন যে, উঁচু জমিতে জল জমে না, সেইরূপ যার 'খুব উঁচু নজর', যে অহংকারী, সে ভগবৎ-কৃপা অনুভব করতে পারে না। যে মুহূর্তে আমরা নীচু হ'তে শিখব, তৎক্ষণাৎ আমরা ভগবৎ-কৃপা অনুভব করতে আরম্ভ ক'রব।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ শিক্ষা দেবার জন্য আসুরিক প্রকৃতির মানবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করার বিষয় বর্ণনা ক'রে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করেন-নি, কারণ ভগবদ্গীতায় অন্যত্র তিনি বলেছেন :

সর্বভূতে আমি সমানভাবে বিরাজ করি ; আমার কেহ প্রিয় নয়, আবার কেহ অপ্রিয়ও নয়। আমার যারা ভক্ত, তারা আমাতে অবস্থান করে ; আমিও স্বভাবতঃ তাদের হৃদয়ে বাস করি।[১]

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮ ॥

কেহ কেহ মনে করেন, ভক্তিলাভের উপায় জ্ঞান।

এখানে অবশ্য জ্ঞান বলতে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় না। ব্রহ্মজ্ঞান পরাভক্তির সহিত অভিন্ন। এখানে জ্ঞানের অর্থ—কেন আমরা প্রার্থনা করি ও

১ গীতা, ৯।২৯

কেনই বা ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হই, তার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা। আমরা কী লক্ষ্য লাভ করতে চাই, সে-সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ঈশ্বরের ধারণা ও আদর্শ সম্বন্ধে; আরও কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—মানব-জীবন কিভাবে ঈশ্বরে সার্থকতা লাভ করে, সে সম্বন্ধে। বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন যে, 'সম্যক্ বোধি' হ'ল নির্বাণ লাভের অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রথম পদক্ষেপ। 'ক্লাউড অব্ আননোয়িং' গ্রন্থে আমরা পাঠ করি, "পূর্বচিন্তা ব্যতীত প্রবর্তক অথবা দক্ষ সাধকদের ভিতর প্রার্থনা ভালভাবে জাগে না।"

আধ্যাত্মিক জীবনে বিচার-বুদ্ধির স্থান গুরুত্বপূর্ণ, যদিও সাধকের বৃথা তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা উচিত।

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে ॥ ২৯ ॥

আবার কাহারও মতে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান ও ভক্তি যেন একটি পাখীর দুটি ডানা; এই ডানার উপর ভর দিয়ে সাধক আধ্যাত্মিকতার উচ্চ স্তরে উড়ে যেতে পারেন। বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে যদি প্রেম যুক্ত না হয় তাহ'লে ইচ্ছা অন্ধ আবেগে পরিণত হয়; এবং বুদ্ধি যদি প্রেম ও ঈশ্বরানুরাগের সাহায্য না পায়, তাহ'লে তা হয়ে পড়ে শুষ্ক। 'ক্লাউড অব্ আননোয়িং' গ্রন্থে আমরা আরও পাঠ করি, এতটুকু আকাঙ্ক্ষা দ্বারা মানব ঈশ্বরের সেবক হবার পথে চালিত হয়; তর্কশাস্ত্রের দ্বন্দ্ব-মূলক নির্ভুল প্রমাণ-পদ্ধতির দ্বারা এটা হয় না, হয় হৃদয়ের নিগূঢ় যুক্তিদ্বারা।"

বুদ্ধি ও ভক্তি উভয়কে হাত ধরাধরি ক'রে যেতে হয়। প্রথমে যুক্তি

ও বিচার দ্বারা আমাদিগকে নিশ্চিত হ'তে হবে যে, শাশ্বত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সেই ঈশ্বর আমাদের অন্যতম সত্তা, তারপর পেতে হবে তাঁর প্রতি অনুরাগ ও প্রেম ; এই অনুরাগ ও প্রেম প্রকাশিত করবে শুদ্ধ জ্ঞান ও পরাভক্তি ; যার ফলে লাভ করা যাবে ঈশ্বরের সহিত মিলন।

স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারঃ ॥ ৩০ ॥

নারদের মতে ভক্তি নিজেই নিজের ফলস্বরূপ।

পরাভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত অভিন্ন ; পরাভক্তি স্বয়ং ফলস্বরূপা। নারদ এর দ্বারা নির্দেশ করেছেন যে, অন্তরস্থ দেবত্বের বিকাশ অন্য কোন কারণের ফল নয়। যা কোন কারণের ফল, তা সীমাবদ্ধ হ'তে বাধ্য ; যেহেতু কার্য-কারণসম্বন্ধ আপেক্ষিকতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে : আধ্যাত্মিক সাধনার কি প্রয়োজন? বেদ, বাইবেল বা অন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার কি প্রয়োজন? এসবই তো আপেক্ষিকতার অধীন ও কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয় নিয়ম-বন্ধনে আবদ্ধ। সংক্ষেপে বলা যায়, বেদান্তবাদীরা যাকে 'মায়া' বলেন, এ-সবই তো সেই মায়ার অন্তর্গত।

কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মায়ার দুটি দিক আছে, বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা আমাদিগকে মায়ার সীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করে এবং অবিদ্যা আমাদিগকে মায়া ও অধিকতর অজ্ঞতার সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধে। শাস্ত্র, উপদেশ ও আধ্যাত্মিক সাধনা বিদ্যা-মায়ার অন্তর্গত ; এই বিদ্যা-মায়া মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে আমাদের সাহায্য করে। ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাভক্তি এই সব সাধনা বা উপদেশের ফল নয়। ঈশ্বর আমাদের অন্তরের মধ্যে পূর্ব থেকে অধিষ্ঠিত আছেন এবং শুদ্ধজ্ঞান, যা

পরাভক্তির সহিত অভিন্ন, ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে সেইখানে রয়েছে। কিন্তু আমাদের অন্তরস্থ ঈশ্বর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা আছেন। যদিও গুরু ও শাস্ত্র কর্তৃক উপদিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনা সীমাবদ্ধ, তবু এই সাধনা অজ্ঞানতা দূর করে। ঐ অজ্ঞানতাও আবার সীমাবদ্ধ। অজ্ঞানতা দূর হ'লে আমাদের অন্তরস্থ দেবত্ব বিকশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ-সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিতেন—পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা দিয়ে সেটি তুলতে হয়, তারপর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

বেদে বলা হয়েছে যে, আমাদের এমন এক অবস্থায় পৌঁছাতে হবে যখন বেদ আর বেদ থাকে না। শঙ্করাচার্য বলেছেন: আত্মার অস্তিত্ব আছে ব'লে বেদ, পুরাণ, সকল শাস্ত্র, সকল জীবের অস্তিত্ব আছে। তাহ'লে যিনি সকলকে প্রকাশ করেন, সেই আত্মাকে এদের কেউ কিভাবে প্রকাশ করতে পারে?

রাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩১ ॥
ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা ॥ ৩২ ॥

কেবলমাত্র রাজার বিষয় জানিয়া ও রাজগৃহ দেখিয়া কেহ রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ জানিলে ও খাদ্যদ্রব্য দেখিলেই কাহারও ক্ষুধার শান্তি হয় না। সেইরূপ ভক্তি না আসা পর্যন্ত শুধু ঈশ্বরের জ্ঞান ও ধারণাদ্বারা কেহ সন্তোষলাভ করিতে পারে না।

বাইবেলে আছে যে, যীশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের নিকট নিজেকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত শিষ্যগণ অবিরত তাঁর সঙ্গে থেকেও তাঁকে চিনতে পারেন-নি।

যীশু টমাসকে বললেন, "তুমি যদি আমাকে জেনেছিলে, তাহ'লে

আমার পিতাকে জানাও তোমার উচিত ছিল ; এবং এখন থেকে তুমি তাঁকে জানলে ও দেখলে।"

ফিলিপ তাঁকে বললেন, "প্রভু! আমাদের পরম পিতাকে দেখান, তাহ'লে আমরা তুষ্ট হব।" যীশু তাঁকে বললেন, "ফিলিপ, বহুদিন আমি তোমার সঙ্গে আছি, তবু এখনও তুমি আমাকে চিনলে না? আমাকে যে দেখেছে, সে পরম পিতাকেও দেখেছে। তাহ'লে কেন তুমি ব'লছ, —'আমাদের পরম পিতাকে দেখান?' তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পরম পিতাতে আছি এবং তিনি আছেন আমাতে? আমি যে-কথা তোমাকে বলি, সে-কথা আমার নয়, কিন্তু যে পিতা আমার ভিতরে বাস করছেন, সে-সব তাঁরই। বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি ও পিতা আমাতে আছেন : অথবা যা করেছি সেই কাজের জন্যই আমাকে বিশ্বাস কর।"

যীশু পিটারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি আমাকে ভালবাসো?" ভালবাসা যখন আসে, তখন ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন।

ঈশ্বর মানবদেহ ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হন, এই সত্যের অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন হ'ল—অবতার-জীবনে (এবং পরেও) তিনি শিষ্য ও ভক্তদের সম্মুখেই নিজেকে রূপান্তরিত করেন, যেমন যীশু করেছিলেন।

আমরা সেণ্ট ম্যাথুর সুসমাচারে পাঠ করি : এবং ছয়দিন পরে যীশু পিটার জেমস্ ও তার ভাই জনকে পৃথক্‌ভাবে ডেকে আনলেন একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর এবং তাঁদের সম্মুখে রূপান্তরিত হলেন—তাঁর মুখমণ্ডল হ'ল সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং তাঁর পরিচ্ছদ হ'ল আলোকের মতো শুভ্র।

ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সখা অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন ; এবং যে তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকে তাঁর নিকটই তিনি প্রকাশিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্যগণের সম্মুখে বহুবার রূপান্তরিত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের বহু বৎসর পরে একদিন স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিমূর্তির একটি ছাঁচ আমার গুরুদেবের নিকট এনে জিজ্ঞাসা করলেন, সেটি তাঁর পছন্দ হয়েছে কিনা। আমার গুরুদেব তখন উচ্চ ভাবভূমিতে আরূঢ় ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বহু রূপ দেখেছেন, তাই জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুরের কোন রূপ?" তাঁর কিশোর বয়সে একদিন তিনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন মা-কালী-রূপে; তারপর সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

নানা রূপে প্রভু আমাদের নিকট আসেন, কিন্তু তিনি নিজে আমাদের নিকট প্রকাশিত না হ'লে এবং তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম গভীর না হ'লে আমরা তাঁকে সব সময় চিনতে পারি না।

এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছি। অনেক বৎসর পূর্বে আমরা চার জন ব্রহ্মচারী হিমালয়ে বদরীনারায়ণ-তীর্থে গিয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে একজন—গুরুদাস মহারাজ ছিলেন পাশ্চাত্ত্য-দেশবাসী। সে সময় কোন পাশ্চাত্ত্যদেশবাসীকে হিন্দু-দেব-মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হলাম, দেখতে পেলাম, বহু যাত্রী মন্দির-প্রাঙ্গণে বসে আছেন, মন্দির-দ্বার রুদ্ধ। আমরাও প্রাঙ্গণের এক কোণে অন্য যাত্রীদের পাশে বসলাম। কয়েক মিনিট পরে দেখতে পেলাম যে, একজন পুরোহিত আমাকে ইসারা ক'রে ডাকছেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হ'লে তিনি বললেন, "তোমার বন্ধুদের নিয়ে আমার সঙ্গে এস।" তিনি আমাদিগকে মন্দিরের দ্বারে আনলেন, মন্দির-দ্বার খুললেন ও আমাদিগকে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করতে দিলেন। অন্য যাত্রীরা মন্দিরে ঢুকতে চাইলে তিনি বললেন, "না, এখনও তোমাদের সময় হয় নি।" এই ব'লে তিনি মন্দির-দ্বার বন্ধ করলেন। তারপর আমরা দেখলাম, তিনি বিগ্রহের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তখন

আমাদের খেয়াল হয়নি যে, পুরোহিতের বিগ্রহের পাশে দাঁড়ানোর নিয়ম নেই, পুরোহিত দাঁড়ান বিগ্রহের সম্মুখে। কয়েক মিনিট দর্শনের পর সেই পুরোহিত আমাদিগকে বাইরে যেতে বললেন ও মন্দির-দ্বার বন্ধ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রধান পুরোহিত আমাদিগকে মন্দিরে ঢুকবার অনুমতি দিলেন না, যদিও আমাদের জন্য তিনি মন্দির-দ্বার থেকে বিগ্রহ দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং যাতে আমাদের দৃষ্টি বাধা না পায়, সে-জন্য এই দর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন এমন এক সময়ে, যখন অন্য যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ত না। এই পুরোহিত আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আমাদের জন্য সুস্বাদু প্রসাদ পাঠাতেন। সম্মানিত অতিথিরূপে আমরা সেখানে তিনদিন তিনরাত্রি বাস করি। সেখানে অবস্থানকালে যে কয়জন পুরোহিত সেখানে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যে পুরোহিত আমাদিগকে গর্ভমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দেখা আমরা আর পেলাম না। সে-সময় শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ হিমালয়ের আলমোড়ায় বাস করছিলেন। ফিরবার পথে এই ঘটনার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "হায়, হায়! তোরা কি বোকা! ঠাকুরকে চিনতে পারলি নে? তিনিই ঐ-রূপে তোদের সামনে আবির্ভূত হ'য়ে, তোদিকে গর্ভমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

তস্মাৎ সা এব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩॥

অতএব, (জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম এই আপেক্ষিক জগতের বিপরীতমুখী অন্যান্য যুগ্মবস্তু সকলের) সীমাবদ্ধ অবস্থার ও বন্ধনের হাত হইতে যাঁহারা মুক্তি চান, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে পরাভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ঈশ্বরই কেবল আমাদের অন্তর পূর্ণ করতে পারেন। তাঁতেই আছে শুধু চিরস্থায়ী আনন্দ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই একাত্মানুভূতি লাভ করি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আবদ্ধ থাকি জন্ম, মৃত্যু ও অন্যান্য বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব বস্তু—সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য প্রভৃতির বন্ধনে।

পরাভক্তি লাভ করলে হৃদয়-মন্দিরে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যে বিরাজিত আছেন, তা উপলব্ধি করা যায় ও তখন সকলের মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করা যায়।

সম্মুখে উপবিষ্ট শিষ্যগণকে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলেছিলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্নরূপে রাম আমার সম্মুখে বসে আছেন।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে পাঠ করি, 'ঈশ্বর বিরাজিত আছেন নীচে, উপরে, সামনে, পিছনে, বামে ও দক্ষিণে। ঈশ্বরই আত্মা। এই আত্মা নীচে, উপরে, সামনে, পিছনে, বামে ও দক্ষিণে সর্বত্র বিরাজিত, আমিই এই সব হয়েছি। যিনি এ বিষয় জানেন ও ধ্যান করেন এবং আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করেন, তিনি আত্মাতে আনন্দ পান, আত্মাতে উল্লসিত হন, আত্মাতে উপভোগ করেন।"[১]

একাত্মানুভূতি লাভ করেছেন এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বর্ণনাপ্রসঙ্গে শঙ্কর বলেছেন, "যা কিছু করুন না কেন—বেড়ান, দাঁড়িয়ে থাকুন, বসে থাকুন বা শুয়ে থাকুন, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি আত্মাতে আনন্দ পান, তিনি মুক্তি ও আনন্দ লাভ ক'রে বাস করেন।"

দেবত্বের পূর্ণ বিকাশরূপ পরাভক্তি যিনি লাভ করেছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে।

এই পরাভক্তি লাভই মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

১ ছান্দোগ্য ৭।২৫।১-২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরাভক্তি লাভের উপায়

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

আচার্যগণ স্তোত্র ও সঙ্গীতদ্বারা নিম্নলিখিতভাবে প্রেমা-ভক্তি লাভের উপায়সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

আচার্য কথাটির গভীর তাৎপর্য আছে। কাকে আধ্যাত্মিক 'গুরু' বলা হয়? যিনি ভগবৎ-সত্য উপলব্ধি করেছেন ও যিনি প্রেমাভক্তি লাভ করেছেন, তিনিই আচার্য—প্রকৃত গুরু। সকল মানবের প্রতি সহানুভূতিতে তিনি উদ্বেল হন এবং ভগবৎ-সত্য উপলব্ধি করতে সাধককে সাহায্য করেন। তিনি যে-কথা বলেন, সেই কথার পিছনে একটা শক্তি থাকে। পুঁথি-পড়া বিদ্যায় কোন কাজ হয় না। শঙ্কর বলেছেন:

পাণ্ডিত্য, সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত ভাষণ, শব্দ-সম্পদ্ এবং শাস্ত্রব্যাখ্যায় নৈপুণ্য পণ্ডিতগণকে আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু এরা মুক্তি প্রদান করতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত শাস্ত্র-পাঠ নিষ্ফল।[১]

এখন একটা প্রশ্ন উঠে, আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন কি? পূর্বে বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য—সূত্র ৩০) যে, পরাভক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান কোন ক্রিয়ার ফল নয় বা কোন কারণের উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মজ্ঞান পূর্ব সম্পাদিত ঘটনা। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবত্ব পূর্ব থেকেই বর্তমান কেবল অজ্ঞতার আবরণে ঢাকা। সেণ্ট জনের সুসমাচারে আমরা পাই কবি, "অন্ধকারের ভিতর আলো জ্বলে এবং অন্ধকার তা বুঝতে

১ বিবেকচূড়ামণি, ৫৮

পারে না।" এই অন্ধকার বা অজ্ঞতা দূর করবার জন্য চাই আধ্যাত্মিক সাধনা।

ভগবৎ-কৃপা সম্বন্ধীয় মতবাদে অন্যভাবে এই সত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কঠোপনিষদে আমরা পাঠ করি, "শাস্ত্র-পাঠ, বুদ্ধির কৌশল বা অধিক শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি যাকে বরণ করেন, সে-ই তাঁকে লাভ করে। তিনি তাঁর সত্তা তার নিকট প্রকাশ করেন।"[১]

কিন্তু কাকে তিনি বরণ করেন? তিনি বরণ করেন তাকেই, যার তাঁকে পাবার প্রবল ইচ্ছা থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "গুরুর কথা মতো কাজ করতে হয়। খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা হলেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর-দর্শন।"

আচার্য শঙ্কর নির্দেশ করেছেন: সাধকের মুক্তির সোজা উপায় হ'ল —শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রার্থনার মাধ্যমে নিয়মিত ভগবৎ-সংযোগ।[২]

কেবলমাত্র 'বেরিয়ে এস' কথাগুলি উচ্চারণ করলে গুপ্তধনের আবরণ খুলে যায় না। ঠিক স্থানে যেতে হবে, গুপ্তধনের উপরের পাথর ও মাটি সরাতে হবে, তারপর গুপ্তধন পাবে। সেইরূপ আত্মার পবিত্র সত্য যা ঢাকা থাকে মায়া ও তার কার্যের দ্বারা, তাকে পাওয়া যায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্দেশিত ধ্যান, গভীর আত্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনাদ্বারা—কিন্তু সূক্ষ্ম তর্কবিতর্কের দ্বারা কখনও নয়।[৩]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে ধারণা হ'তে পারে যে, এই উদ্ঘাটন আমাদের নিজের চেষ্টায় হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই সকল সাধনাদ্বারা আমরা

১ কঠ, ১।২।২৩
২ বিবেকচূড়ামণি, ৪২
৩ বিবেকচূড়ামণি, ৬৫

ভগবৎ-কৃপা অনুভব করি। শুধু আনন্দানুভূতি অথবা সবিকল্প বা নির্বিকল্প সমাধি, যে-কোনরূপ উপলব্ধি হোক না কেন, প্রত্যেক যোগী পুরুষ সে কথা স্বীকার করেন। এই উপলব্ধি চেতন-ভূমিতে এত সহসা দীপ্তি পায় যে, যোগী বুঝতে পারেন, এই উপলব্ধি আসছে কোন দূরের বস্তু থেকে, ঠিক যেন একটা বড় চুম্বক স্বাভাবিক চেতন-ভূমির বাইরে থেকে তাঁর মনকে টেনে আনছে এই উপলব্ধিতে। এটাই হ'ল ঈশ্বর ও তাঁর কৃপার সোজাসুজি উপলব্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যগণকে বলতেন, "কৃপার বাতাস তো বইছেই, তোরা শুধু পাল তুলে দে।" আমার গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, "তোরা যদি ঈশ্বরের দিকে এক পা এগিয়ে যাস, তিনি তোদের দিকে এগিয়ে আসবেন একশো পা।"

আমার গুরুদেব আরও বলতেন, "সংসারে সাফল্য লাভ করবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। কখনও সে সফল হয়, কখনও হয় বিফল। সাফল্য লাভ করলেও সে-সাফল্য হয় ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে যদি কেউ সাধনা করে, সে কখনও বিফল হয় না। সে বস্তুলাভ করবেই এবং সে-বস্তু চিরস্থায়ী।"

নারদ ইতিপূর্বে লক্ষ্যের—সেই পরাভক্তির, সত্য প্রকৃতির—সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এখন সেই লক্ষ্যে কি উপায়ে উপনীত হওয়া যায়, সেই কথা বলছেন। এদের মধ্যে যে-কোন একটি বা কয়েকটি বা সব কয়টি উপায় অবলম্বন করলে লক্ষ্যে পৌছানো যায়।

এগুলিকে দুভাগ করা যায়—নেতিবাচক ও ইতিবাচক। উভয়েরই প্রয়োজন আছে, তবে প্রেমাভক্তির পথে ইতিবাচক দিকটির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "আলোর দিকে এগিয়ে গেলে, অন্ধকার পিছনে পড়ে থাকে।" আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে পাঠ করি: "ঈশ্বরের প্রতি

অনুরক্ত হও, ঈশ্বরে হৃদয় দৃঢ়ভাবে স্থাপন কর, তাহ'লে পাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ঈশ্বরদর্শন।"

নিম্নলিখিত সূত্রে নেতিবাচক পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে :

তৎ তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

পরাভক্তি লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ত্যাগ করিতে হয় ও তাহার প্রতি আসক্তিও ত্যাগ করিতে হয়।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও তার প্রতি আসক্তির প্রকৃত অর্থ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এদের বলতেন, 'বিষয়বুদ্ধি' এবং বিষয়বুদ্ধির সংজ্ঞা দিতেন, 'কামিনী ও কাঞ্চনে' আসক্তি।

আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ অপরিহার্য। আসল কথা হ'ল এই যে, বিচারের তরবারি ঘোরাতে হবে। আমার গুরুদেব বলতেন, "বিচার কর, শাশ্বত আনন্দলাভের জন্য ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সুখ বিসর্জন দাও।"

খ্রীষ্টের বাণীতে আমরা ঐ একই বিচারের উপদেশ পাই। সেণ্ট ম্যাথুর সুসমাচারে আমরা পড়ি, পৃথিবীতে তোমরা ধন সঞ্চয় কোরো না ; এখানে কীট ও মরচে সে ধন নষ্ট ক'রে দেবে, চোর চুরি করবে। ধন সঞ্চয় করবে স্বর্গে, সেখানে কীট ও মরচে তা নষ্ট করবে না, চোর চুরি করবে না। যেখানে তোমার ধন সঞ্চিত আছে, সেখানেই রয়েছে তোমার হৃদয়ও।"

একদিন আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ধর্ম কাকে বলে ?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন : 'মন-মুখ এক করা'কে ধর্ম বলে। অতএব কাম ও লোভ ত্যাগ শুধু দৈহিক হলেই হবে না, মনেও তাদের ত্যাগ করতে হবে।

ভগবদ্‌গীতায় আমরা পাঠ করি, "শারীরিক কয়েকটি কাজ ত্যাগ ক'রেও যার মন পড়ে থাকে বিষয়বস্তুর উপর, সে নিজেকে প্রতারণা করে। তাকে কেবল মিথ্যাচারী বলা যেতে পারে।"[১]

কয়েকজন মনস্তত্ত্ববিদ্ একে 'অবদমন' বলেন; তাঁদের মতে এটা জটিলতা সৃষ্টি করে। সে-জন্য তাঁর বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করার পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু ঐ রোগের এটা ওষুধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, যদি কেউ জৈব বাসনার বশ্যতা স্বীকার করে, তাতে তার সুখভোগের লালসা তৃপ্ত হয় না, সে সেই লালসাকে বাড়িয়েই তোলে। তা ছাড়া ইন্দ্রিয়াদির সুখভোগের সামর্থ্যও সীমাবদ্ধ। মনের বাসনা ক্রমাগত বেড়ে চলবে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত হবে না। স্বীকার করা উচিত যে, এই অতৃপ্তি আনবে নৈরাশ্য এবং দুই বিরুদ্ধ শক্তির ফলস্বরূপ দেখা দেবে নানারূপ জটিলতা।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একজন মহান্ মনস্তত্ত্ববিদ্, এবং তিনি আমাদিগকে ভণ্ড হ'তে বারণ করেছেন। এই রোগ নিবারণের জন্য তিনি কোন্ ঔষধের কথা বলেছেন?—"প্রকৃত প্রশংসনীয় ব্যক্তি তাঁর ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ইন্দ্রিয়-গণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁর সকল কর্ম নিঃস্বার্থ। ব্রহ্মলাভের পথে তাঁর সকল কর্ম চালিত হয়।"

যদি কেউ নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা না ক'রে ইন্দ্রিয়গণের বশ্যতা স্বীকার করে, তা'হলে চিন্তাকে ভগবন্মুখী করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়। সে প্রার্থনা করতে পারে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের উপর।

প্রার্থনা তখন হয় নিরর্থক। শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশমূলক এক গল্পে বলেছেন: ও দেশে মাঠে জল আনে, মাঠের চার দিকে আল দেওয়া আছে, পাছে জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে

---

১ গীতা. ৩।৬

মাঝে ফোগ, গর্ত। প্রাণপণে তো জল আনছে, কিন্তু ফোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

সেইজন্য নারদের মতে, ইন্দ্রিয়গুলির সুখভোগের বিষয়বস্তু শুধু ত্যাগ করা নয়, সেই সব বিষয়বস্তুর উপর আসক্তিও সেইসঙ্গে ত্যাগ করতে হবে।

পরবর্তী সূত্রে ইতিবাচক দিকের কথা বলা হয়েছে :

অব্যাবৃত-ভজনাৎ ॥ ৩৬ ॥
লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্তনাৎ ॥ ৩৭ ॥

নিরবচ্ছিন্নভাবে সতত ভগবানের ভজনাদ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়।

জীবনের সকল কর্মে নিযুক্ত থেকেও ভগবানের গুণ শ্রবণ ও কীর্তনদ্বারা ভক্তি লাভ হয়।

একে ইতিবাচক পদ্ধতি বলে—ঈশ্বরের নিরবচ্ছিন্ন ভজনা। সতত অবিরামভাবে ঈশ্বরে হৃদয় ও মন স্থির রাখার মতো অবস্থা লাভ করা যায় আধ্যাত্মিক সাধনার অভ্যাসদ্বারা। সাধক তখন ঈশ্বরের সঙ্গে ভ্রমণ করেন, তাঁর সঙ্গে আহার করেন, তাঁর সঙ্গে নিদ্রা যান। সর্বদা তাঁর উপস্থিতি উপলব্ধি ক'রে তিনি দিন যাপন করেন। ব্রাদার লরেন্স বলেছেন, "ঈশ্বরকে জানতে হ'লে বার বার তাঁর কথা চিন্তা করতে হবে; যখন আমরা তাঁকে ভালবাসতে পারব, তখন তাঁর কথা আমাদের বার বার মনে পড়বে, কারণ তখন আমাদের হৃদয় আমাদের পরমধনের সঙ্গে থাকবে।"

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন,—"অনন্যচিত্ত হয়ে যে যোগী সর্বদা

আমাকে স্মরণ করে, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর নিকট আমি সহজে ধরা দিই।"[১]

অনন্যচিত্ত হয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন—বহু বৎসর যাবৎ অভ্যাস।

মহান্ যোগী পতঞ্জলি বলেছেন, "ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে অনন্যচিত্তে বহুকাল ধ'রে চর্চা করলে অভ্যাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।"

শঙ্কর এক মহান্ সত্য নির্দেশ ক'রে বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য সততার সহিত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তিনি সাধনকালেই একজন সিদ্ধ পুরুষের মতো হয়ে যান।

কি করলে আমরা সেই অবস্থা পাবো, যখন আমরা আমাদের হৃদয় ও মনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরে স্থির রাখতে পারবো?

বহু প্রকার পদ্ধতি আছে। ইষ্টমূর্তির ধ্যান, তাঁর নাম জপ, আনুষ্ঠানিক পূজা, প্রভুর নাম-গুণ কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর ধ্যান-ধারণা, ভগবদ্‌ভক্তের সেবা, মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সেবা, উপাসনা মনে ক'রে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি—এবং গুরুনির্দেশিত কোন বিশেষ সাধনা—এই সব সাধককে তার লক্ষ্যে উপনীত করে।

অন্য কার্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও ভক্ত কিভাবে ঈশ্বরে তার মন স্থির রাখতে পারে, সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক উদাহরণ দিয়েছেন: গ্রাম্য রমণী, মাথার উপর জলের কলসী, কলসীর ভারসাম্য ঠিক রাখবার জন্য মন পড়ে আছে কলসীর উপর, কিন্তু এ দিকে সে অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব করছে। সতী স্ত্রী, তার মন পড়ে আছে স্বামীর উপর, তিনি কখন বাড়ী ফিরবেন; সেই সঙ্গে মেয়েটি রান্নার কাজ করছে, শিশুসন্তানকে স্তন্য দান করছে।

১ গীতা, ৮।১৪

ইষ্টনাম ও ইষ্টচিন্তা যে ঈশ্বরে মন স্থির রাখার সহায়ক, এ বিষয়ে সকল ধর্মমতেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।

সকল সম্প্রদায়ের বেদান্তবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, ইষ্টদেব ও তাঁর নাম অভিন্ন।

ঈশ্বর সম্পর্কে পতঞ্জলি বলেছেন, ঈশ্বরের পরিবর্তে 'ওম্' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ঐ শব্দটি বার বার উচ্চারণ করতে হবে ও সেই সঙ্গে ঐ শব্দের অর্থের বিষয় ধ্যান করতে হবে। এতে আসবে 'পুরুষ' (আত্মা)-এর জ্ঞান, ধ্বংস হবে জ্ঞান-পথের সকল বাধা।

কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "সকল বেদ যে লক্ষ্যের বিষয় ঘোষণা করছে, সকল প্রকার তপস্যাদি কর্ম যার অন্তর্নিহিত, যার অন্বেষণে লোকে ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই বিষয় সংক্ষেপে বলছি। তা হ'ল : 'ওম্'।

"এই অক্ষরই ব্রহ্ম। এই অক্ষর সত্যই সর্বোৎকৃষ্ট। এই অক্ষর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অবলম্বন ও সর্বোত্তম প্রতীক। যিনি এ কথা জানেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞরূপে সম্মানিত হন।"[১]

মুণ্ডকোপনিষদে আমরা পাঠ করি, "অনুপম উপনিষদ্-ধনুকে লাগাও ভক্তিমূলক উপাসনারূপ ধারালো বাণ, তার পর একাগ্র মনে ও প্রেমমগ্ন হৃদয়ে ঐ বাণে টান দাও ও অক্ষয় ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ কর।

"ওম্ ধনুক, জীবাত্মা বাণ ও ব্রহ্ম লক্ষ্য। প্রশান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য স্থির কর। লক্ষ্যে বাণকে যেমন ছেড়ে দেওয়া হয়, সেইরূপ তাঁতে নিজেকে ছেড়ে দাও।"[২]

'ওম্' শব্দটি ছাড়া ঈশ্বরের আরও অন্য প্রতীক বা নাম আছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে প্রভু, তোমার বহু নাম,

১ কঠ, ১।২।১৫-১৬

২ মুণ্ডক, ২।২।৩-৪

প্রত্যেকটি নামে তোমার শক্তি বিরাজিত। এই নামস্মরণে দেশ-কালের কোন নিয়ম নেই। এইরূপ তোমার কৃপা।"[১]

ঈশ্বরের নামকে বলা হয় 'মন্ত্র'। অনেক নাম, মন্ত্রও অনেক; সেই মন্ত্র নির্ভর করে ঈশ্বরের যে বিশেষ ভাবমূর্তিকে ভক্ত আরাধনা করতে পছন্দ করেন, তার উপর। দীক্ষাদানকালে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দান করেন। ভক্তের ইষ্টদেবের অস্তিত্ব ঐ মন্ত্রের ভিতর কেন্দ্রীভূত করা হয় একটি শব্দ-সংকেতের আকারে। এই শব্দসংকেতগুলি মুনি-ঋষিগণের গূঢ়তম আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশ করে। মন্ত্র-জপের সময় মন্ত্রের অর্থের উপর ধ্যান করার অর্থ এই যে, নাম-জপের সময় সাধককে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করার চেষ্টা করতে হয়। দীক্ষা-দানকালে এই মন্ত্রের সাহায্যে গুরু আধ্যাত্মিক শক্তি প্রেরণ করেন। মন্ত্রে যে শক্তি সঞ্চারিত করা হয়েছে, নাম-জপের দ্বারা তা শিষ্যের মধ্যে প্রকট হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রার্থনায় আরও বলেছেন:

"হে নাম, চন্দ্রালোকের মতো হৃদয়পদ্মে ঝরে পড়, তোমাকে জানবার জন্য হৃদয়-দুয়ার খুলে দাও। হে আত্মা, অবিরাম তাঁর নাম কীর্তন কর। প্রতি পদে তাঁর অমৃত আস্বাদন কর। তাঁর নামে স্নান ক'রে তাঁর আনন্দ-তরঙ্গে নিমগ্ন হও।"

নূতন ও পুরাতন দুটি বাইবেলে ঈশ্বরের নামজপ-রূপ আধ্যাত্মিক সাধনা অনুমোদিত হয়েছে: "প্রভুর নাম-গুণগান কর, এস, আমরা এক সঙ্গে তাঁর নাম গান করতে করতে উল্লসিত হই।"[২]

"এস, আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রশংসার অর্ঘ্য অবিরত নিবেদন করি, ঈশ্বরের জন্য তাঁর নাম-গুণগান করা আমাদের ওষ্ঠাধরের ফল।"[৩]

১ শিক্ষাষ্টকম্
২ Psalms
৩ Hebrews

"যে কেউ ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রার্থনা করবে, সে-ই উদ্ধার হবে।"[১]

সেণ্ট জনের সুসমাচারে লিখিত আছে, "সত্য সত্যই আমি তোমাকে বলছি; আমার নাম নিয়ে পরম পিতার নিকট তুমি যা চাইবে, তিনি তোমাকে তাই দেবেন। এখন পর্যন্ত আমার নাম নিয়ে তুমি কিছুই চাও নি, চাও, চাইলেই পাবে, তোমার আনন্দ পূর্ণ হবে।"

যীশুর প্রার্থনা এক প্রকার মন্ত্র। এই প্রার্থনা 'ইষ্টার্ন অর্থডক্স চার্চ'-কর্তৃক স্বীকৃত। দু-খানি বিখ্যাত পুস্তক 'দি ওয়ে অব্ এ পিলগ্রিম' এবং তার পরিশিষ্ট 'দ্য পিলগ্রিম কন্‌টিনিউজ্ হিজ্ ওয়ে'-তে এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পুস্তকে উনবিংশ শতাব্দীর একজন রুশ-দেশীয় ভক্তের আধ্যাত্মিক তীর্থ যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে:

"যীশুর অবিরাম আন্তরিক প্রার্থনার অর্থ হ'ল—ওষ্ঠদ্বারা মনে, হৃদয়ে যীশুর স্বর্গীয় নাম নিয়ে সতত নিরবচ্ছিন্ন প্রার্থনা; প্রার্থনার সময় তাঁর সতত উপস্থিতির এক মানসিক চিত্র নির্মাণ করতে হবে। প্রার্থনার ভাষা, "Lord Jesus Christ, have mercy on me."—প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, আমার প্রতি কৃপা কর। এই আকুল আবেদনে অভ্যস্ত হ'লে ফলস্বরূপ উপলব্ধি করা যায় এক গভীর সান্ত্বনা, অনুভব করা যায় এই প্রার্থনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা। তখন এই প্রার্থনা ছাড়া থাকা যায় না, নিজের ভিতর থেকে প্রার্থনা উঠতে থাকে আপনা হ'তে।···

"বার বার একই প্রার্থনা জানানোকে তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করেন যে, এটা মূর্খের যন্ত্রচালিত চিন্তাহীন কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা জানেন না যে, এই যন্ত্রচালিত অভ্যাসের ফলস্বরূপ কী রহস্য উদ্ঘাটিত হয়; তাঁরা জানেন না যে, ওষ্ঠদ্বারা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত এই মন্ত্রজপ ইন্দ্রিয়ের অগোচরে পরিণত হয় হৃদয়ের অকৃত্রিম আকুল আবেদনে, এই জপ

---

১ Romans

জীবনের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, আনন্দস্বরূপ হয়, আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক হয়, আনে আলোক ও পুষ্টি, নিয়ে যায় ঈশ্বর-সংযোগের পথে।"

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এই নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরত ঈশ্বরের পূজা বিষয়ে উপদেশ সংক্ষেপে বলা হচ্ছে :

"দিবারাত্রি ঈশ্বরচিন্তা কর, অন্য চিন্তা যতদূর সম্ভব কোরো না। দৈনন্দিন যে-সব চিন্তার প্রয়োজন, তা করবে তাঁরই মাধ্যমে। আহারে তিনি, পানে তিনি, নিদ্রাতেও তিনি ; সর্বত্র সব কাজে তাঁকে দর্শন করবে। অপরকে ভগবৎকথা বলবে। এটা খুবই উপকারী।

"যখন সমস্ত অন্তঃকরণ অবিচ্ছিন্ন ধারায় ঝ'রে পড়ে ঈশ্বরে, যখন অর্থ, নাম বা যশ অন্বেষণের সময় থাকে না, যখন ঈশ্বর ছাড়া অন্যবস্তু চিন্তা করার সময় থাকে না, তখন তোমার হৃদয়ে আসবে সেই অসীম বিস্ময়কর প্রেমের আনন্দ। প্রকৃত প্রেম বর্ধিত হয় প্রতি মুহূর্তে এবং এ প্রেম সর্বদা নূতন—অনুভবের দ্বারা তা জানা যায়। প্রেম সর্বাপেক্ষা সহজ সাধনা। প্রেম স্বাভাবিক, তাই যুক্তির জন্য অপেক্ষা করে না। প্রতিপাদনের প্রয়োজন নেই, নেই প্রমাণের প্রয়োজন। আমরা নিজের মনের দ্বারা, বিচারদ্বারা বস্তুকে সীমাবদ্ধ করি। জাল ফেলে আমরা কোন কিছুকে ধরি তারপর বলি যে, আমরা তাকে প্রতিপাদন করেছি। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা কখনও জাল ফেলে ধরতে পারি না।"

বিবেকানন্দ নিজেই তাঁর গুরুদেবের প্রতি ভালবাসার একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনকে অন্তরের সহিত ভালবাসতেন। কিশোর নরেনকে পরীক্ষা করবার জন্য একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কয়েকমাস যাবৎ নরেনকে উপেক্ষা করলেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রাখলেন। তারপর একদিন নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোকে এত উপেক্ষা করি, তবু কেন বার বার আমাকে দেখতে আসিস?' নরেন উত্তর দিলেন,

"আমি আপনাকে ভালবাসি, তাই আপনাকে দেখতে আসি।" প্রকৃত ভালবাসায় কোন অভিপ্রায় থাকা উচিত নয়।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব [ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা] ॥ ৩৮ ॥
মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥ ৩৯ ॥
লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ॥ ৪০ ॥

প্রধানতঃ মহাপুরুষের কৃপায় ভক্তি লাভ হয়।

কিন্তু সাধুসঙ্গ দুর্লভ, কারণ সাধু চিনিতে পারা খুব কঠিন; কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ হইলে তাহার ফল অব্যর্থ।

একমাত্র ভগবৎ-কৃপাতেই মহাপুরুষ-সঙ্গ লাভ করা যায়।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তিনি মহান্ গুরু হন। তিনি দেবমানব। আমরা উপনিষদে পাঠ করি, "সত্য সত্যই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হয়ে যান।" এরূপ গুরুর কৃপালাভ ও ভগবৎ-কৃপালাভ একই বস্তু।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দেবেন। মানুষ গুরু (যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন) যেন একটি নালা, সেই একই পুকুরের জল তার ভিতর দিয়ে যায়।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে পাঠ করি:

"আধ্যাত্মিক সদসৎ বিচার, পুণ্যকর্ম, যাগযজ্ঞ, পাঠ, তপশ্চর্যা, পবিত্র মন্ত্র জপ, তীর্থভ্রমণ, নিষ্পাপ আচরণ—এ সব আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে সাহায্য করে: কিন্তু সর্বাধিক সাহায্য করে সাধুসঙ্গ; অনেকেই দেবমানবগণকে ভালবেসে ও তাঁদের সেবা ক'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, বেদপাঠ ও তপশ্চর্যাদ্বারা নয়।"[১]

১ শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১২।১-২ ও ৭

যিনি গুরু, তিনি শিষ্যের দিব্যদৃষ্টি উন্মীলন করেন। বিশ্বসার-তন্ত্রে আমরা নিম্নলিখিত গুরুস্তোত্রটি দেখতে পাই :

"সেই সদ্‌গুরুকে আমি নমস্কার করি, যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, যিনি পরম সুখ প্রদাতা, যিনি নির্লিপ্ত, যিনি পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নন, যিনি জ্ঞানমূর্তি, যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, যিনি গগন-সদৃশ নিষ্পাপ, যিনি তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের লক্ষ্য, এক, নিত্য, বিমল, অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী, ভাবাতীত ও ত্রিগুণরহিত।"[১]

এই স্তোত্রে আমরা সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য জানতে পারি।

এমন কি ঈশ্বরের অবতারগণকে, ঈশ্বরের পুত্রকে ও ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণকেও গুরু বরণ করতে হয়েছিল। ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অবতারগণ গুরুর শিষ্য হয়েছিলেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং রামকৃষ্ণের গুরু ছিলেন। অবতারগণ আমাদিগকে ঈশ্বরাভিমুখী পথ প্রদর্শন করেন।

রাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো এমারসন তাঁর 'ইউসেস অব্‌ গ্রেট ম্যান' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন :

"আমাদের চক্ষুতে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তি চিত্রিত করতে সুন্দর পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তিরও তাঁর গুণাবলী অপরকে সমর্পণ করতে তার বেশী কিছু প্রয়োজন হয় না।...মহৎসঙ্গে আমাদের চিন্তা ও আচরণ মহৎ হয়। এই সংক্রমণ এত দ্রুত হয় যে, একদল লোকের মাঝে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি থাকলে সকলেই জ্ঞানী হন।... আমিত্ব-ভরা চক্ষুকে নির্মল করতে মহৎ ব্যক্তিগণ অঞ্জন-স্বরূপ। মহৎ ব্যক্তিগণের শক্তির এটাই চাবি, তাদের শক্তি আপনা থেকে ছড়িয়ে পড়ে।"[২]

১ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদম্‌...ইত্যাদি

২ Uses of Great Man

গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেকানন্দের লেখা থেকে পুনরায় উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে, "বন্ধনমুক্ত পুরুষের শরণ লও, যথাসময়ে তিনি কৃপা ক'রে তোমাকে মুক্ত করবেন।"

গুরুকৃপা বা ভগবৎ-কৃপা একই বস্তু। সেই কৃপা পেলে সাধক পরাভক্তি ও ব্রহ্মসংযোগ লাভ করেন।

বলা হয়েছে, 'মহাপুরুষের কৃপালাভ করলে তার ফল অব্যর্থ।' মহানির্বাণ-তন্ত্রে আমরা পাঠ করি, "মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ং ভবেৎ।" —গুরুর নিকট থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করা মাত্র শিষ্যের ব্রহ্মের সহিত সংযোগ ঘটে।

ইতিহাসগত অথবা পরম্পরাগতভাবে আমরা জানি যে কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধের ন্যায় ঈশ্বরের অবতারগণ স্পর্শদ্বারা পাপীকে ঋষিতে পরিণত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও আমরা জানি যে, তিনি মাতাল ও বেশ্যাগণকে সাধুতে পরিণত করেছিলেন। এইরূপ একজনকে—গিরিশ ঘোষকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাঁর উপস্থিতিতে লোকে পবিত্রতা অনুভব ক'রত।

আমরা আরও দেখেছি,—শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ এবং আরও অনেকে কিভাবে পাপীর প্রকৃতি পরিবর্তন করতেন এবং সেই পাপী হয়ে যেত পবিত্র নারী বা পুরুষ।

একজন শিষ্যের সহিত আমার গুরুদেবের কথাবার্তা শুনে আমার দৃঢ়প্রত্যয় হয়েছিল যে, গুরুকৃপার ফল অব্যর্থ। মহারাজ শিষ্যকে বললেন, "মৃত্যুর পর তোমার কি হবে, তার ব্যবস্থা আমি ইতিপূর্বেই ক'রে রেখেছি [এর অর্থ—মৃত্যুর মুহূর্তে শিষ্য ঈশ্বর দর্শন করবেন ও জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের নিকটে যাবেন।] কিন্তু জীবিত অবস্থায় যদি মুক্তির আনন্দ পেতে চাও, তাহলে চেষ্টা কর, সাধনা কর।"

তুমি যেন ট্রেনে উঠেছ; ঘুমোও বা জেগে থাকো, তুমি তোমার

গন্তব্যস্থলে নিশ্চয় পৌছাবে। তবে জেগে থাকলে পথের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে যাবে।

উল্লিখিত শিষ্যটি একবার নির্জনে বাস ও তপশ্চর্যা করবার অনুমতি ভিক্ষা করলেন তাঁর গুরুদেবের (মহারাজের) নিকট। কিন্তু 'মহারাজ' শিষ্যের দুর্বলতার বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা তপশ্চর্যা করবে কেন? আমরা যে তোমাদের জন্য সব কিছু ক'রে দিয়েছি।" মহারাজ শিষ্যকে বললেন, "আমাকে ভালবাসো।" আরও তিনবার মহারাজ ঐ শিষ্যকে বলেছিলেন—তাঁকে ভালবাসতে।

গুরুকে ভালবাসলে ঈশ্বরকে ভালবাসা হয়। গুরুকে চিন্তা করলে মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইষ্টদেবকে চিন্তা করতে আরম্ভ করে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, গুরু শিষ্যকে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। আমাদের গুরুদেব 'মহারাজ' (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাদের নিকট উপস্থিত থাকলে আমরা অনুভব করতাম যে, ঈশ্বরদর্শন সহজ ও সরল। গুরু শিষ্যকে এই সত্য উপলব্ধি করিয়ে দেন যে, ঈশ্বর তার খুব অন্তরঙ্গ। তিনি তার খুব নিকটে, তার ভিতরে অন্তর্যামীরূপে সর্বদা বিরাজিত আছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। মহাপুরুষদের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ বিপথে যান ও কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হন বলে মনে হয়। এমন কি অবতারগণের শিষ্যদের মধ্যেও এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। আরও দেখা যায়, ভগবদ্দর্শন লাভ করেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্যেও কেউ কেউ বিষয়াসক্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। কেন এরূপ হয়?

এর উত্তরে হিন্দুরা বলেন, প্রারব্ধ কর্ম—পূর্বজন্মের সংস্কারের ফল. এমন সব প্রবণতা আছে, যা নিঃশেষ করা প্রয়োজন। এইসব ব্যক্তি পূর্বজন্মের যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে ভুলতে পারেন না। তাঁরা পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, দ্বিগুণ উৎসাহে আত্মসংযম লাভ করেন ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকদংশনে জর্জরিত এক শিষ্যকে বলেছিলেন, "তুই গুরুর কৃপা পেয়েছিস্, তুই ভয় পাবি কেন? সাহস অবলম্বন কর্। তীব্র বাসনার যত ঝড়ই আসুক না কেন, যে গুরু-কৃপা লাভ করেছে, সে কখনও সংসার-সাগরে ডুবে যেতে পারে না।"

খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মত পোষণ করেন যে, বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে যীশুর যে শিষ্য তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই জুডাস খ্রীষ্টের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুরা এ কথা বিশ্বাস করেন না। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, জুডাসও স্বর্গে পরম পিতার নিকট গিয়েছে, কারণ জুডাস তাঁর গুরুদেব ঈশ্বরের অবতার যীশুখ্রীষ্টের কৃপা লাভ করেছিলেন।

এস, আমরা প্রভুর প্রার্থনা স্মরণ করি, "প্রলোভনের ভিতর আমাদিগকে নিয়ে যেও না।" এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনা, "মা! তোমার ভুবন-মোহিনী মায়ায় আমাদিগকে মুগ্ধ কোরো না।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে যে, দেবগণও মহামায়ার স্তব করেছিলেন:

"আপনি সমস্ত জগৎকে মোহগ্রস্ত করেছেন, আবার আপনিই প্রসন্ন হ'লে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে জন্মমৃত্যু প্রভৃতি সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করেন।"[১]

মহামায়া আমাদিগকে যে-সব প্রলোভনের মধ্যে নিয়ে যান, সেগুলি কি? মহামায়ার ভুবনমোহিনী মায়াই বা কি? ঈশ্বরের নিজ শক্তিই এই মহামায়া। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণ এই সৃষ্ট জগতের সুখ ভোগ করতে চায়; তারা ভুলে যায় যে, ঈশ্বর—যিনি মুক্তি ও আনন্দের আদি কারণ, তিনি আমাদের ভিতর বিরাজিত।

এখন ৩৯ সংখ্যক সূত্রের প্রথম অংশ বিবেচনা করা যাক্। 'সাধুসঙ্গ' দুর্লভ, কারণ সাধু চিনতে পারা খুবই কঠিন।

---

১ চণ্ডী, ১১।৫

যীশু পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যে, মহাপুরুষকে চেনা খুব কঠিন। "...জন খেতেও আসতেন না, পান করতেও আসতেন না; লোকে ব'লত, তার একটা শয়তান আছে। 'মানুষের ছেলে' খেতে আসে, পান করতে আসে; তারা ব'লত, ঐ পেটুক ও মাতাল লোকটিকে দেখ, সে সরাই-ওয়ালা ও পাপীদের বন্ধু।"

আমার গুরুদেব বলতেন, "ক-জন তৈরী আছে? হ্যাঁ, অনেকে আমাদের কাছে আসে বটে। দেবার মতো ধনও আমাদের অনেক আছে; কিন্তু তারা চায় শুধু আলু, পেঁয়াজ আর বেগুন।"

অন্যভাবে বলা যায়, তৃষ্ণার্ত হ'লে শীতল জল ভাল লাগে। "অন্বেষণ কর, পাবে।"

কঠোপনিষদে আমরা পাঠ করি: "অনেকে আত্মার বিষয় শুনতেই পায় না। যাঁরা শোনেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বুঝতে পারেন না। বিস্ময়কর তিনি, যিনি একথা বলেন। বুদ্ধিমান্ তিনি, যিনি এই শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভাগ্যবান্ তিনি, যিনি সদ্‌গুরুর উপদেশে এ-বিষয় বুঝতে পারেন।

"অজ্ঞ লোকের উপদেশে আত্মার সত্য সম্পূর্ণভাবে বোঝা যায় না। আত্মার ব্যাখ্যা অত্যন্ত দুরূহ ও যুক্তি-বিদ্যার বাইরে। যে গুরু আত্মা ও ব্রহ্মকে অভেদ জানেন, তাঁর উপদেশে অসার মতবাদকে পিছনে ফেলে রেখে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[১]

সেণ্ট ম্যাথুর সুসমাচারে আমরা পাঠ করি, "উপদেশ-মূলক গল্পের মাধ্যমে যীশু তাঁহাদিগকে অনেক কথা বলেছিলেন, 'একজন বীজ-বপনকারী বীজ বপন করতে গিয়েছিল। বীজ ছড়াবার সময় কতকগুলি বীজ প'ড়ল রাস্তার উপর, পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে গেল; কতকগুলি প'ড়ল পাথুরে মাটির উপর, সেখানে মাটি ছিল কম, চারা জন্মালো বটে, কিন্তু মাটি

১ কঠ, ১।২।৭-৮

গভীর না থাকায় সূর্য উঠলে সেগুলি ঝলসে গেল, শিকড় না থাকায় সেগুলি শুকিয়ে গেল ; আরও কতকগুলি বীজ প'ড়ল ভাল মাটিতে ; তারাই শস্যভারে সফল হ'ল,—কারও একশটি শীষ, কারও ষাটটি বা তিরিশটি। যার কান আছে, সে শোন।'

তাই পুনরায় যীশুকে বলতে শুনি, "শূকরের সম্মুখে মুক্তা ছড়িও না"।[১]

শঙ্করাচার্য সত্যই নির্দেশ করেছেন, "একমাত্র ঈশ্বরের কৃপায় আমরা তিনটি সুযোগ লাভ করতে পারি, "মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষসংশ্রয়" অর্থাৎ মনুষ্য-জন্ম, মোক্ষলাভের ইচ্ছা ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শিষ্যত্ব।[২]

মোক্ষলাভের জন্য যখন প্রবল ইচ্ছা জন্মায়, সাধক যখন ঈশ্বর-লাভের জন্য ব্যাকুল হন, তখন জমি বীজ বপনের উপযোগী হয়। সাধক তখন গুরুর কৃপা লাভ করেন। যখন সাধক বিশ্বস্তভাবে আগ্রহের সহিত আধ্যাত্মিক জীবন অন্বেষণ করেন, আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রেরককে তখনই আসতে হয়।

তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥ ৪১ ॥

ভক্ত ও ভগবানে ভেদ নাই।

ঈশ্বর তাঁর অসীমতায় সকল জীবের মধ্যে বাস করছেন ; অর্থাৎ ব্রহ্ম যিনি অদ্বিতীয়, অসীম, পূর্ণ ও সত্য, তিনি বিরাজিত আছেন সকল জীবে ও সর্বত্র। সংস্কৃতভাষায় একটা কথা আছে, 'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তম্' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সকলের মধ্যে তিনি সমানভাবে বিরাজ করেন। কিন্তু প্রকাশের পরিমাণে পার্থক্য আছে। মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। সেজন্য বলা হয়, 'ধন্য মনুষ্য-জন্ম'। কারণ মানুষেরই

১ Luke, 7-6

২ বিবেকচূড়ামণি-৩

আছে ঈশ্বরোপলব্ধি ও ব্রহ্ম-সংযোগ লাভের সুযোগ ও শক্তি। আবার মানুষের মধ্যে তাঁর ভক্তগণের ভিতর পূর্ণ প্রকাশ—যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যাবার পর ভক্তগণ তাঁদের মনোহরণকারী প্রিয়তম প্রভু ভগবানের প্রেমিক হয়ে থাকেন। ঈশ্বর কারও প্রতি পক্ষপাত করেন না; তিনি আমাদের সকলকে ভালবাসেন; কিন্তু ভগবদভক্ত তাঁর অন্তরঙ্গ। ভক্তগণই কেবল জানেন ও অনুভব করেন সেই হৃদয় অভিভূতকারী ভগবৎপ্রেম।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্ দুর্বাসা-মুনিকে বলছেন:

"আমার ভক্তগণকে আমি ভালবাসি আমার প্রেমে আমি স্বেচ্ছায় তাদের দাসত্ব বরণ করি। অন্য আর কি হ'তে পারে? এই সকল ভক্ত যে আমার জন্য স্বেচ্ছায় সর্বস্ব উৎসর্গ করে। তারা সম্পূর্ণভাবে আমার শরণাগত।"[১]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ভাগবত ভক্ত ও ভগবান্—একই বস্তু। একবার তাঁর একটি দর্শন হয়: শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মূর্তি থেকে একটি আলোক-রশ্মি বের হয়ে স্পর্শ করে তাঁকে ও ভাগবত-গ্রন্থকে—দেখিয়ে দেয় যে ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্—তিনটি একই বস্তু।

মুণ্ডক-উপনিষদে আমরা পাঠ করি:

"জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানেন, ব্রহ্ম—যিনি সকলের আশ্রয়, যিনি বিশুদ্ধজ্যোতিতে প্রকাশ পান, যাঁর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যাঁরা নিষ্কামভাবে এইরূপ জ্ঞানীর উপাসনা করেন, তাঁরা জন্ম ও মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করেন।"[২]

ভক্তগণ নিজেরাই একটি শ্রেণী, তাঁদের নেই কোন ধর্ম কুল বা জাতি, বিশেষ কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্তও তাঁরা নন। তাঁরা হিন্দু নন, খ্রীষ্টান নন,

১ শ্রীমদ্‌ভাগবত ৯।৪।৬৩
২ মুঃ উঃ

মুসলমান নন, ইহুদীও নন—তাঁরা শুধু ঈশ্বরের ভক্ত নারী ও পুরুষ—জাতি ও ধর্মের অনেক উর্ধ্বে। অতএব এইরূপ একজন ভগবদ্‌ভক্তের কৃপা লাভ ও ভগবৎ-কৃপা লাভ একই বস্তু।

তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

অতএব মহাপুরুষের কৃপালাভের জন্য প্রার্থনা কর।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, যদি কারও মনে ভগবান্‌লাভের প্রবল ইচ্ছা হয় এবং সত্যই যদি তিনি ভগবৎপ্রেম লাভের জন্য উৎসুক হন, তাহ'লে তিনি তাঁর গুরু খুঁজে পাবেন, যে গুরু তাঁকে আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে যেতে পারেন ও ভগবৎপ্রেম লাভের উপায় দেখিয়ে দিতে পারেন।

অতএব সাধকের পক্ষে সদসৎ বিচার দ্বারা ভগবান্ লাভের প্রবল ইচ্ছা জন্মানোই বিশেষ প্রয়োজন।

শঙ্কর নির্দেশ করেছেন: "মোক্ষলাভের ইচ্ছা সামান্য বা মাঝারি ধরনের হ'লেও গুরুকৃপায় এবং ত্যাগ ও শান্তি প্রভৃতি পুণ্যের সাধনাদ্বারা সেই ইচ্ছা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। এই ইচ্ছার ফলও পাওয়া যায়।"[১]

১ বিবেকচূড়ামণি, ২৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সৎসঙ্গ ও প্রার্থনা

দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্বপ্রকারে দুঃসঙ্গ ত্যাগ কর।

দুঃসঙ্গ ত্যাগ কর, আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম অবস্থায় এটা বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "যখন চারা গাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।" গাছ বড় হ'লে কত লোককে ছায়া দেয়।

দুঃসঙ্গ বলতে শুধু বিষয়ী লোকের সংসর্গ বুঝায় না, লোভ-উদ্রেককারী বস্তুসকলকেও বুঝায়। উপনিষদের একটি প্রার্থনায় আছে :

"আমরা কর্ণে যেন শ্রবণ করি তোমার কল্যাণ বচন, চক্ষুতে যেন দর্শন করি তোমার পবিত্রতা, সুস্থির দেহে তোমার উপাসনা ক'রে যেন দেবকর্মে জীবন যাপন করি।"

একটা কথা আছে : "জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর ও সর্ব বস্তুতে ব্রহ্ম দর্শন কর।"

আমরা দেখি, মহাপুরুষগণ সাধু ও পাপীর মধ্যে পার্থক্য করেন না। মহাপুরুষের কৃপা লাভের জন্য যাঁরা তাঁর শরণাগত হন, তাঁরা যত বড় পাপ কাজ করুন না কেন, তাঁরাও উচ্চ অবস্থা লাভ করেন ও সময় হ'লে তাঁরাও সাধুতে পরিণত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, সকলের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, তাই ব'লে তুমি বাঘকে কোলে কোরো না। যাই হোক, দেবমানবের উপস্থিতিতে বাঘও তার হিংস্রতা ভুলে যায় ও মেষশিশুতে পরিণত হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার গুরুদেব 'মহারাজে'র জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। মাদ্রাজে একদিন আমার ও আমার এক গুরুভাই-এর সঙ্গে মহারাজ বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় কোথা থেকে একটা পাগলা ষাঁড় এসে কয়েক গজ দূর থেকে মাথা নামিয়ে আঘাত হানবার জন্য আমাদের দিকে আসতে লাগল। আমার গুরুভাই ও আমি মহারাজকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর সামনে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মহারাজ হাত বাড়িয়ে আমাদের পিছন ঠেলে দিলেন ও নিজে ষাঁড়ের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কিছু ইতস্ততঃ ক'রে ষাঁড়টি শান্ত হ'ল ও কয়েকবার এপাশ ওপাশ মাথা দুলিয়ে আমাদের রাস্তা ছেড়ে দিল।

কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকারণত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥
তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি ॥ ৪৫ ॥

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, কারণ ইহা কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্বনাশের কারণ।

কামক্রোধাদি রিপু প্রথম অবস্থায় ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় থাকে, কিন্তু অসৎসঙ্গের ফলে ইহারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় বিশাল আকার ধারণ করে।

কতকগুলি সংস্কার নিয়ে আমরা জন্ম গ্রহণ করি এবং ইহজন্মের কাজ ও চিন্তাদ্বারা নূতন কতকগুলি সংস্কারের সৃষ্টি করি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাল আবার কয়েকটি মন্দ। আমরা সকলেই ভাল ও মন্দে মিশানো। গতজন্মের ও ইহজন্মের সংস্কারগুলি বীজের মতো। সৎসঙ্গ করলে ভাল বীজগুলি বর্ধিত হবার সুযোগ পায় ও মন্দগুলি হয়ে যায় সুপ্ত। সেইজন্য অসৎসঙ্গ ত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গ করার গুরুত্ব এত বেশী।

ভগবদ্গীতায় আছে: "বিষয়চিন্তা করলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে।

আসক্তি থেকে জন্ম নেয় কাম। কাম বাধা পেলে উৎপন্ন হয় ক্রোধ। ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ। মোহের জন্য স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। স্মৃতিভ্রংশ ঘটলে বুদ্ধি নাশ হয়, সদসৎ-বিচারের শক্তি থাকে না। সদসৎ বিচার-শক্তি হারালে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না।"[১]

এই প্রসঙ্গে শঙ্করের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া প্রয়োজন :

"জেনে রাখো যে, সে ব্যক্তি প্রতারিত, যে ইন্দ্রিয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ভয়ানক পথে চলে ও প্রতি পদক্ষেপে সর্বনাশের নিকটবর্তী হয় ; এবং এটাও সত্য বলে জেনে রাখো যে, তাঁর প্রকৃত হিতৈষী গুরুদেবের এবং তাঁর নিজের উন্নততর বিচার-বুদ্ধির নির্দেশিত পথে যিনি চলেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের সর্বোত্তম ফল পান।

"তুমি যদি সত্যই মোক্ষ লাভ করতে চাও, তাহ'লে ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগের বিষয়বস্তুকে বিষ মনে ক'রে সেগুলিকে দূরে রাখো এবং সন্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা শান্তি ও সংযমরূপ পুণ্যকে অমৃত মনে ক'রে আনন্দের সহিত সেই অমৃত পান করতে থাকো।"[২]

কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্ ? যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি,
যো মহানুভবং সেবতে, যো নির্মমো ভবতি ॥ ৪৬ ॥

মায়াকে কে অতিক্রম করিতে পারেন ? যিনি সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করেন, যিনি মহাপুরুষগণের সেবা করেন, যিনি 'আমি' ও 'আমার' বোধ হইতে মুক্ত।

মায়া কাকে বলে ? এখানে মায়া বলতে বুঝায় অজ্ঞতা, যে-অজ্ঞতা সত্যকে লুকিয়ে রাখে। মানুষ স্বরূপতঃ ঈশ্বর, কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান

১ গীতা, ২।৬২-৬৩
২ বিবেক চূড়ামণি, ৮১-৮২

নামে পরিচিত কোন এক দুর্জ্ঞেয় শক্তিদ্বারা আমাদের ভিতরের সেই ঈশ্বরত্ব ঢাকা থাকে। আত্মা ব্রহ্মের সহিত এক। আত্মাই আমাদের ভিতর অপরিবর্তনীয় সত্তা। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ যে আত্মাকে দেহ, মন, ইন্দ্রিয় ও চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করে সে সীমাবদ্ধ জীব; তখন সে তার ঈশ্বর-স্বরূপতা ভুলে থাকে। এই মায়া বা অজ্ঞান বাস্তব ঘটনা; সত্যের সঙ্গে অসত্য মিশে যে অজ্ঞান (ভ্রম) উৎপন্ন করে, সেই অজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সকলেরই প্রত্যক্ষ করা ঘটনা। শঙ্কর নির্দেশ করেছেন যে, যে বস্তু আত্মা নয় তা কর্ম বা বিষয় (Object), এবং আত্মা বিষয়ী (Subject); এ দুটি আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর-বিরোধী এবং এদের যুক্ত করা যায় না—এদের পরস্পরের বিপরীত ধর্মের যোগসাধন তো আরও কঠিন। তবু যিনি অপরিবর্তনীয় আনন্দস্বরূপ আত্মা, সেই মানুষ কোন এক দুর্জ্ঞেয় শক্তিদ্বারা চালিত হয়ে সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশিয়ে যা আত্মা নয় এমন বস্তুর প্রকৃতি ও ধর্ম নিজের ওপর আরোপ করেন, ক্রমে মানসিক ও দৈহিক গুণ ও কার্যের সহিত নিজেকে অবিচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত করেন। আমরা বলি 'আমি মোটা' বা 'আমি ক্লান্ত'; একবারও চিন্তা করি না এই 'আমি'টা কে?

আমরা আরও এগিয়ে যাই। যে বস্তু বা অবস্থা বাইরের, তাকে নিজের ব'লে আমরা দাবী করি। আমরা ঘোষণা করি, 'আমি একজন গণতন্ত্রী' অথবা 'এ বাড়ীটি আমার'। আমরা বিশ্বের সকল বস্তুকে কম-বেশী আমাদের অহমিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করি। এ-দিকে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা, আমাদের অন্তরে বিরাজিত ঈশ্বর, আমাদের এই সব উদ্ভট ভাবভঙ্গী হ'তে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট থেকে সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন—যদিও নিজ চেতনার আলোকে মনকে উদ্ভাসিত করেই তিনি এসব ঘটান, যে উদ্ভাস ছাড়া মায়ারও অস্তিত্ব থাকে না। এই মায়া

আবার সর্বজনীন। বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন মায়া আছে, তেমনি আছে মূর্খের মধ্যেও। কেবল যখন আত্মোপলব্ধিরূপ জ্ঞানসূর্যের উদয় হয়, তখনই এই মায়া অন্তর্হিত হয়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

"এই গুণময়ী মায়া অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু যাঁরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেন, একমাত্র তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হ'তে পারেন।"[১]

মায়া অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করা। এই আত্ম-সমর্পণের বিষয় পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মায়া জয় করার জন্য নারদ আর কি উপায়ের কথা বলেছেন, এখন আমরা সে-বিষয়ের আলোচনা করছি।

যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি—যিনি সর্বপ্রকার আসক্তি ত্যাগ করেন। কিসের আসক্তি? সংসারের আসক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব দুটি শব্দে এই আসক্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: 'কামিনী ও কাঞ্চন'। তপশ্চর্যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার গুরুদেব বলতেন, "এটা হচ্ছে রিপুগণের দমন ও ইন্দ্রিয়সংযম, যাতে তারা তাদের ভোগ্য বস্তুর দিকে ধাবিত না হয়। আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে এর জন্য চাই চেষ্টা ও অভ্যাস।"

ভগবদ্গীতায় আছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন :

"হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মের সহিত সমত্বরূপ যোগের কথা আপনি বর্ণনা করলেন। কিন্তু মন এত চঞ্চল যে, কি-ভাবে ঐ যোগ স্থায়ী হ'তে পারে, তা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

"মন অত্যন্ত চঞ্চল বলে তা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিক্ষুব্ধ, বলবান্ এবং বিষয়-বাসনার জন্য দুর্ভেদ্য; বায়ু নিরোধ করা অপেক্ষাও এ কাজ কঠিন।"[২]

১ গীতা, ৭।১৪

২ গীতা, ৬।৩৪-৩৫

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন :

"অর্জুন, মন যে চঞ্চল তাতে সন্দেহ নেই ; মনকে বশীভূত করাও কঠিন। কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যসহায়ে তাকে সংযত করা যায়। অসংযত-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই যোগ লাভ করা কঠিন ব'লে মনে হয়, কিন্তু প্রবল চেষ্টা ও বিহিত উপায় অবলম্বনদ্বারা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি এই যোগ লাভ করতে পারেন।"[১]

সেণ্ট অগষ্টিন একে বলেছেন, "অবিচলিত আত্মনিয়ন্ত্রণ ও চিত্তশুদ্ধি।"

ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা পাঠ করি, "...আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।" (ছান্দোগ্য, ৭।১৬।২)। খাদ্য পবিত্র হ'লে হৃদয় পবিত্র হয়। হৃদয় পবিত্র হ'লে ঈশ্বরের নিত্য স্মরণ-মনন হয়।

খাদ্য পবিত্র হওয়ার অর্থ কি? খাদ্য বলতে আমরা যা খাই শুধু তা বুঝায় না, আরও বুঝায় সেই সব বস্তু যা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে সংগ্রহ করি। পবিত্র খাদ্য আহার করা খুব সহজ। বাহ্য পবিত্রতা সহজে লাভ করা যায় ; কিন্তু মনের পবিত্রতা, হৃদয়ের পবিত্রতা লাভই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সকল মহাপুরুষ এরূপ পবিত্রতা লাভ করেছেন, তাঁরা আমাদের বলেন যে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-বস্তুর প্রতি আসক্তি বা বিরক্তির মনোভাব পোষণ না ক'রে তাদের মধ্যে চলাফেরা করতে হবে। এইরূপে আহার পবিত্র হয়।

এবং যখন আহার পবিত্র হয়, তখন হৃদয়ও হয় পবিত্র ; তখনই আসে ঈশ্বরের নিত্য স্মরণ-মনন।

নিত্য স্মরণ-মনন সেই অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় মন ঈশ্বরের দিকে ছুটে চলে অবিচ্ছিন্ন জলস্রোতের মতো, কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ তাতে কোন ছেদ টানে না ; উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'তৈলধারার' মতো।

মন যখন অবিচ্ছিন্ন জলস্রোতের মতো ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়,

১ গীতা, ৬।৩৫-৩৬

সাধক তখন পরাভক্তি লাভ করেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়।

খ্রীষ্ট তাঁর 'সারমন্ অন্ দি মাউণ্টে' বলেছেন, "যাদের হৃদয় পবিত্র তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বর দর্শন করবে।"[১]

পবিত্রতার লক্ষণ হচ্ছে ঈশ্বরের নিত্য স্মরণ-মনন এবং এই স্মরণ-মননই ঈশ্বরের প্রতি পরাভক্তি।

'মনে মনে সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করতে হবে।' প্রাথমিক অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা খুবই কঠিন। কিন্তু প্রতিবার নূতনভাবে চেষ্টা করলে এই শক্তি আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ধিত হয়।

সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ভক্ত নিষ্কাম অবস্থা প্রাপ্ত হন। সাধারণ বিষয়ী লোকের একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। একজন লোক কোন রমণীকে ভালবাসে, কিছু দিন পরে সে অন্য এক রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল, তাকে ভালবাসতে লাগল এবং প্রথম রমণীকে ত্যাগ ক'রল। সেই রমণীটি তার মন থেকে সহজভাবে ধীরে ধীরে মুছে গেল, সে তার অভাব বুঝতেও পারল না।

সেণ্ট ফ্রান্সিস দ্য সেলস্ তাঁর 'ট্রীটিজ্ অন্ দি লাভ্ অব্ গড' গ্রন্থে লিখেছেন :

"সকল প্রকার প্রেমের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমকে এত বেশী পছন্দ করতে হবে যেন আমরা মনে মনে সর্বদা প্রস্তুত থাকি যে, এই প্রেমের জন্য অন্য সব প্রেমকে আমরা ত্যাগ করতে পারি।"

আমার গুরুদেব আমাদের প্রায়ই জোর দিয়ে বলতেন, 'সাধনা কর্, সাধনা কর্।' হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি ধ্যান করতে হয় এবং এই সাধনার মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে আরম্ভ করি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অভিভূতকারী প্রেম, এবং তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম স্বাভাবিক-

১ Blessed are the pure in heart for they shall see God

ভাবে উদয় হয়। "সাধনা কর্, সাধনা কর্, ধ্যান কর্, ধ্যান কর্" আমার গুরুদেবের এই কথাগুলি এখনও সুস্পষ্টভাবে আমার কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "স্বয়ং ঈশ্বরের ভালবাসা নিষ্প্রভ ক'রে দেয় বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য ভালবাসাকে, তাকে নিক্ষেপ করে এক পাশে—ছায়ার মাঝে। ভক্তিযোগ উচ্চতর প্রেমের বিজ্ঞান। ভক্তিযোগ আমাদিগকে দেখিয়ে দেয়, কিভাবে প্রেমকে সোজা পথে চালানো যায়, সংযত করা যায়, পরিচালনা করা যায়, ব্যবহার করা যায়, নূতন লক্ষ্য দান করা যায়, দেখায়, এই প্রেম থেকে কিভাবে সর্বোত্তম ও মহিমময় ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ কি করলে এই প্রেম আমাদিগকে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার পথ প্রদর্শন করবে। ভক্তিযোগ বলে না, 'ত্যাগ কর', শুধু বলে, 'ভালবাসো—ভালবাসো সর্বোত্তমকে'। ভালবাসার পাত্র যদি সর্বোচ্চ হয়, নীচের যা কিছু সব স্বাভাবিকভাবে তলিয়ে যায়।"

পদ্মপত্রের জন্ম জলে হ'লেও তার উপর জল থাকে না, ঝ'রে পড়ে যায়; সেই পদ্মপত্রের মতো আমরা তখন সংসারে বাস করি। সংসারে বাস কর, কিন্তু সংসারী হ'য়ো না।

যো মহানুভবং সেবতে—যিনি মহাপুরুষগণের সেবা করেন। আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক একজন গুরুর প্রয়োজনীয়তার বিষয় পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরাভক্তি লাভের উপায় গুরুকৃপা।

পরাভক্তি ও জ্ঞানলাভের জন্য গুরুসেবা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একটি হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থে আমরা পাঠ করি, "কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়লে যেমন জল পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর অধিকারে, সেই গুরুর সেবা করলে ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়।" গুরুর শিষ্যকে মুক্তি প্রদান করবার শক্তি আছে।

ধর্মশাস্ত্রসমূহে বহু বিস্ময়কর সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু সেই সব

সত্যের দৃষ্টান্তস্থাপনকারীর অভাব হ'লে সত্য জীবন্ত রূপ ধারণ করে না। এই সকল দৃষ্টান্তস্থাপনকারী মহাপুরুষের সেবা করা আধ্যাত্মিক সাধকের পক্ষে প্রয়োজন।

ভগবদ্গীতা অনুসারে শিষ্যকে তিনটি কাজ করতে হবে: শিষ্য গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করবেন, এটার অর্থ এই যে, শিষ্য ঈশ্বরলাভের প্রবল ইচ্ছা পোষণ ক'রে বিনীতভাবে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হবেন। তারপর শিষ্যকে প্রশ্ন করতে হবে। গুরু যখন শিষ্যকে উপদেশ দিবেন, গুরুর কথাগুলি ভাসা-ভাসাভাবে গ্রহণ করলে চলবে না। উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করতে হবে, যাতে তাঁর মন থেকে সকল সংশয় দূর হয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে গুরুর সেবা করতে হবে।

গুরুকে সেবা করার প্রয়োজনীয়তা যদিও খুব বেশী, তবু তার অর্থ এই নয় যে, শুধু কায়িক সেবা করতে হবে। একটি উপনিষদে আমরা পাঠ করি, "গুরুর মুখ থেকে ব্রহ্মের সত্য শুনবে, তার পর সেই সত্য বিচার করবে; সবশেষে গুরুর উপদেশমত সেই সত্যকে ধ্যান করবে।"

অতএব গুরুসেবার আর একটি অর্থ হচ্ছে, গুরুর উপদেশমত কাজ করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী শিবানন্দ একদিন বলেছিলেন, "তোরা কি মনে করিস, তোদের মধ্যে যারা সেবকরূপে আমার নিকট আছে, তারা ছাড়া আর কেউ আমার সেবা করে না? যারা মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে আছে, এমন কি দূর দেশে আছে, তারা যদিও আমাকে দেখতে পায় না, তবু তারা ঠাকুরের কাজ করে ও ঈশ্বরচিন্তা করে বলে তারা ঠাকুরের ও আমার সেবা করছে।"

কন্তরতি···যো নির্মমো ভবতি।—যিনি 'আমি' ও 'আমার' বোধ থেকে মুক্ত, তিনি মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন।

ইতিপূর্বে মায়া যে অজ্ঞান, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের সত্য প্রকৃতি ঈশ্বরীয়, পবিত্র, মুক্ত ও জ্ঞানভাস্বর। কিন্তু এই মায়া, এই

অজ্ঞানের অন্ধকার, আমাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মের আলোককে আবৃত ক'রে রেখেছে।

'জেন'[১] এ অনুরূপ এক সত্যের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। হাকুইনের 'দ্য সঙ্ অব্ জাজেন' থেকে উদ্ধৃতি (অনুবাদ) দেওয়া হল :

"সকল জীব মূলতঃ বুদ্ধ,
ঠিক যেন জল ও বরফ,
জল ছাড়া বরফ থাকে না ;
জীব ছাড়া বুদ্ধ থাকে না।
এ সত্য যে তাদের কত নিকটে, জীব তা জানে না,
খুঁজে বেড়ায় দূরে, আরও দূরে—হায় কি দুঃখ !
ঠিক যেন জলে বাস ক'রে
তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে ডাক দেয়, 'জল, জল, জল' ব'লে,
ঠিক যেন ধনীর ছেলে পথ হারিয়েছে গরীবের মাঝে !
পথ হারিয়েছে তারা অজ্ঞতার অন্ধকারে,
তাই তাদের যেতে হয় ছয়টি জগতে, অন্য দেহে, অন্য অবস্থায়
ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার থেকে অন্ধকারে
জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াবে তারা কিভাবে ?"

অজ্ঞতার অন্ধকারের প্রথম সন্তান—এই 'অহং'-ভাব, 'আমি' ও 'আমার' এই ভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" মেঘ ঢেকে রাখে সূর্যের আলোককে। মেঘ সরে গেলে সূর্য দেখা যায়। 'অহং'ভাব এই মেঘের মতো ঢেকে রেখেছে আত্মা বা ব্রহ্মের আলোককে। গুরুর কৃপায় এবং তাঁর উপদেশমত কাজ করার ফলে যখন এই 'অহং'-ভাবের নাশ হয়, তখন ঈশ্বরের সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

১ Zen Buddhism : জাপানে প্রচলিত 'বৌদ্ধধ্যান

সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অ্য সেলস্ তাঁর 'লেটার্স্ টু পারসন্স্ ইন রিলিজন' গ্রন্থে লিখেছেন, "ঈশ্বর তোমাকে চান সম্পূর্ণরূপে, বাধাহীনভাবে, তোমার আত্মাকে হ'তে হবে একেবারে আবরণহীন।"

ব্রহ্ম ও ব্যক্তিগত আত্মার মাঝে দাঁড়িয়ে 'অহং'ভাব পার্থক্য সৃষ্টি করে। পুকুরের জলের উপর একটি লাঠি রাখলে মনে হয়, জল যেন দুভাগ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এক জল, লাঠির জন্য মনে হয় দুভাগ। অহংকার হচ্ছে ঐ লাঠি, যা আমাদিগকে ঈশ্বর থেকে পৃথক্ রাখে।

এই অহংকার কি? যে বলে 'আমি এটা, আমি সেটা, আমি বুদ্ধিমান্, আমি ধনী, আমি মহান্, আমি শক্তিমান।' কি করলে এই 'অহং'ভাব, এই 'আমি' ও 'আমার'-ভাব ত্যাগ করা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে কিছু ব্যাবহারিক উপদেশ দিয়েছেন, প্রথমে তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, কেবলমাত্র সমাধি লাভ করলে এই অহং সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। তারপর তিনি বলেন: অহং প্রায় যায় না। হাজার বিচার কর, অহং ফিরে ঘুরে এসে উপস্থিত হয়। আজ অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখো ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। একান্ত যদি 'আমি' যাবে না, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে। হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু আমি দাস, এই ভাবে থাকো। 'আমি দাস, আমি ভক্ত' এরূপ আমিতে দোষ নাই; মিষ্টি খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।...আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণ গান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্ লাভ করবে, কোন সন্দেহ নাই।...ঠিকভাবে (দাস আমি) যদি হয়, তা হ'লে কাম ক্রোধের কেবল আকার মাত্র থাকে। যদি ঈশ্বরলাভের পর 'দাস আমি' বা 'ভক্তের আমি' থাকে, সে ব্যক্তি কারও অনিষ্ট করতে পারে না। পরশমণি ছোঁয়ার পর তরবারি সোনা হয়ে যায়; তরবারির আকার থাকে, কিন্তু কারও হিংসা করে না। নারিকেল গাছের বেল্লো শুকিয়ে ঝ'রে প'ড়ে গেলে, কেবল দাগমাত্র থাকে। সেই দাগে এইটি

টের পাওয়া যায় যে, এককালে ঐখানে নারিকেলের বেল্লো ছিল। সেই রকম যাঁর ঈশ্বরলাভ হয়েছে, তাঁর অহংকারের দাগ মাত্র থাকে, কাম ক্রোধের আকার মাত্র থাকে, বালকের অবস্থা হয়। বালকের কোন জিনিসের উপর টান করতেও যতক্ষণ—তাকে ছাড়তেও ততক্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেন: সংসারী ব্যক্তি সন্তানদের আদর যত্ন করবে। তাদের 'বাল গোপাল' ব'লে মনে করবে। পিতাকে 'ঈশ্বর' ও মাকে 'ভগবতী' মনে ক'রে সেবা করবে। সর্বজীবে অবস্থিত ঈশ্বরের সেবা করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন:

'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি"

সাধককে 'আমি কর্তা' এই ভাব থেকে মুক্ত হ'তে হবে।

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি,
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি ॥ ৪৭ ॥

যিনি নির্জনে বাস করেন, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করেন, যিনি তিনগুণের অতীত হন এবং নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন।

কৈবল্য-উপনিষদে কয়েকটি সুন্দর শ্লোক আছে, সেগুলিকে উপরের সূত্রের টীকারূপে এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে।

'নির্জনে বাস করতে যাও। কোন পবিষ্কার স্থানে আসন গ্রহণ কর ও সোজা হ'য়ে বোসো, মাথা ও ঘাড় যেন এক সরল রেখায় থাকে। সংসারের প্রতি উদাসীন হও। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত কর। গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম কর। তারপর হৃদয়পদ্মের উপর পবিত্র আনন্দময় ব্রহ্মের উপস্থিতি ধ্যান কর।

"ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিন্তার অতীত, অসীম। তিনি সর্বমঙ্গল-কারী, তিনি চিরশান্ত, অমর। তিনি এক, তাঁর আদি মধ্য বা অন্ত নেই; তিনি সর্বব্যাপী।···তিনি অসীম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।

"মুনিগণ তাঁর ধ্যান করেন এবং সেই সর্বজীবের মূল ও সর্বস্রষ্টার নিকট উপস্থিত হন, তাঁরা সকল অন্ধকারের পারে যান। তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, তিনি ইন্দ্র, তিনি সর্বোত্তম অপরিবর্তনশীল সত্তা। তিনিই সব হয়েছেন। মুক্তিলাভের আর অন্য কোন উপায় নেই।"[১]

উপরিউক্ত উপদেশগুলি সম্পর্কে এখন পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করা যাক্।

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে—যিনি নির্জনে বাস করেন।

নারদ সকল সাধককে সাধু-সঙ্গ ও মহাপুরুষদের কৃপা লাভ করতে উপদেশ দিয়েছেন। এখন তিনি বলছেন যে, সাধককে নির্জনে বাস করতে হবে। সারা জীবন নির্জনে বাস করার কথা তিনি বলেননি—তাহ'লে আত্মকেন্দ্রিক হবার আশঙ্কা থাকে। কয়েক দিনের জন্য বা মাঝে মাঝে নির্জনে বাস করার বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং শুধু যে সাধুদের জন্য নির্জন বাস প্রয়োজন তা নয়, গৃহীদের জন্যও এর প্রয়োজন আছে। নির্জনে বাস করার অর্থ, চিত্তবিক্ষেপকারী সাংসারিক সকল বস্তু থেকে দূরে বাস ক'রে সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্-গীতায় বলেছেন: জনতার হট্টগোল ও তার নিষ্ফল গোলমাল ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান ক'রে নিঃসঙ্গ জীবনের দিকে তোমার চিন্তা ফিরাও।

নির্জনে বাস করার সময় ধ্যান, জপ, কীর্তন, শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রের বিষয়বস্তুর ধ্যানদ্বারা ঈশ্বরলাভের ইচ্ছাকে আরও প্রবল করা প্রয়োজন। এইভাবে কিছু সময় কাটালে সাধকের ভগবৎপ্রেম বর্ধিত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

১ কৈবল্য, ৫৮

"মাখন তুলতে হ'লে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে ব'সে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখ, এই মনে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হ'য়ে যায়। সংসারে কেবল কাম-কাঞ্চনের চিন্তা।

"সংসার জল আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখো, তাহ'লে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনাদ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।"

যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি—যিনি সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করেন। 'যখন মনরূপ দুধ ভগবৎ-প্রেমরূপ মাখনে পরিণত হয়,' তখন আর সাধকের সংসারের প্রতি আসক্তি থাকে না। এরূপ ব্যক্তি সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পান। তাঁর যে সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাবার প্রয়োজন আছে, তা নয়; তিনি যদি গৃহী হন, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ত্যাগ ক'রে তাঁর কোথাও যাবার দরকার নেই; কিন্তু তিনি নিজ পরিবারকে ঈশ্বরের পরিবার ব'লে দেখতে শেখেন, পরিবার-বর্গের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে দর্শন করেন এবং তাঁদের সকলকে আরও বেশী ভালবাসা দিয়ে সেবা করেন। কারণ, পরিবারের প্রতি তাঁর ভালবাসা তখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসায় পরিণত হয়।

নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি—তিনি তিনগুণের অতীত হন।

এর সর্বোত্তম ভাষ্য গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তা নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল:

কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত ও সখা অর্জুনকে বলছেন যে, তিনটি গুণ প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন। তাদের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্ব নিজেকে প্রকাশিত করে

পবিত্রতা, নির্মলতা ও মানসিক শান্তির মাধ্যমে, রজঃ অস্থিরতা, কাম ও কর্মতৎপরতার ভিতর এবং তমঃ অজ্ঞতা ও জড়তার ভিতর। বিবর্তন প্রক্রিযায় সত্ত্ব আদর্শের প্রতীক, যাকে উপলব্ধি করতে হয়; রজঃ শক্তির প্রতীক, যা এই উপলব্ধিকে সম্ভবপর করে এবং তমঃ জড়পদার্থের প্রতীক, যাকে রজঃ নাড়াচাড়া ক'রে এমনভাবে গঠন করে যেন সত্ত্বকে পাওযা যায়। এই তিনটি গুণ পরস্পরের উপর নিত্য ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। একটি গুণ যখন অপর দুটি গুণ অপেক্ষা অধিকতব প্রভাবশালী হয়, তখন মানুষেব মনের ভাবের পরিবর্তন হয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই তিনটি গুণই বন্ধনের কারণ। এরা আত্মাকে শরীরে আবদ্ধ বাখে, আত্মার সত্য প্রকৃতি জানতে বাধাব সৃষ্টি করে। তমঃ আলস্য, বুদ্ধিহীনতা ও ভীরুতা দ্বারা এবং রজঃ কাম, লোভ ও আসক্তি-মূলক কর্মতৎপরতাদ্বারা আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে, এমন কি সত্ত্বগুণও জ্ঞানদানের পরিবর্তে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তিদ্বারা আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, বন্ধনগুলি ছিন্ন ক'রে মুক্ত হবার জন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই তিনটি গুণ জয করতে হবে। সদসৎ বিচারদ্বারা এগুলি জয় কবা যায়। এই গুণগুলির বা এদের জন্য উৎপন্ন মনোভাবের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করা উচিত নয। এই গুণগুলি তাঁকে যে-কাজে প্রবৃত্ত করায, সেই কাজের সহিত নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করাও তাঁর উচিত নয। তাঁকে মনে বাখতে হবে যে, এই গুণগুলিই ঐসব কাজের কর্তা, তিনি নন। তিনি দূর থেকে আত্মার সঙ্গে এক হ'য়ে তাদের প্রতি লক্ষ্য বাখবেন। সুখ ও দুঃখ, প্রশংসা ও নিন্দা, ধন ও দারিদ্র্যকে তিনি সমভাবে দেখবেন। তিনি কখনও আনন্দ বা হতাশার শিকার হবেন না। তিনি কোন কিছুরই অভাব বোধ করবেন না।

পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, যদি কেউ অবিচলিত-

ভাবে আমার উপাসনা করে, সে এই তিনটি গুণের অতীত হ'তে পারে।

যোগক্ষেমং ত্যজতি—তিনি নিজের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন।

এই সূত্রগুলির উপদেশ শ্রেষ্ঠ উপদেশ। সব উপদেশগুলিকে কেউ একসঙ্গে অনুসরণ করতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তার চেষ্টা ও অভ্যাস ক্রমশঃ বাড়াতে হবে; তারপর যখন হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বাড়তে থাকবে তখন সাধক সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ঐসকল উপদেশ অনুসরণ করতে পারবেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জীবনধারণের জন্যেও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে কে পারেন? পারেন কেবল তিনি, যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের শরণ নিয়েছেন ও সর্বদা তাঁর সশরীরে উপস্থিতি অনুভব করেন।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য অর্জুনকে বলছেন, "যে ভক্ত অবিচলিত চিত্তে আমাকে উপাসনা করেন ও আমাকে ধ্যান করেন, সেই নিত্য-সমাহিত ভক্তের প্রয়োজনীয় বস্তুর ভার আমি বহন করি ও তার সম্পত্তি সংরক্ষণ করি।"[১]

এই শ্লোকের সহিত একটি চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক উপাখ্যান সংযুক্ত আছে। এক ব্যক্তি মহাপণ্ডিত ছিলেন, তিনি পুরোহিতের কাজ করতেন। তিনি ভগবদ্‌গীতার একটি ভাষ্য রচনা করছিলেন। এই শ্লোকটির ভাষ্য রচনা করার সময় তিনি হতবুদ্ধি হলেন; তাঁর মনে হ'ল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিভাবে বহন করবেন? তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে শব্দটি প্রক্ষিপ্ত, তাই তিনি 'বহাম্যহম্' শব্দটি কেটে দিয়ে তার স্থানে লিখলেন 'দদাম্যহম্'।

বাড়ি থেকে কিছু দূরে একটি গ্রামে ঐ পণ্ডিত পৌরোহিত্য করতেন।

১ গীতা, ৯।২২

প্রতিদিন তাঁর যে আয় হ'ত, তাতে তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের সে দিনের ব্যয় কোন ক্রমে সংকুলান হ'ত। তিনি যেদিন গীতার শব্দটি কেটেছিলেন, সেদিন ঘটনাচক্রে তাঁকে পুরোহিতের কাজের জন্য যেতে হয়েছিল সেই দূরবর্তী গ্রামে, আর সেখানে ঝড় উঠল এবং সারা দিন-রাত সে ঝড়ের আর বিরাম নেই; তাঁর পক্ষে বাড়ি ফিরে আসা অসম্ভব হ'ল। পরদিন বাড়ি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের উপোস ক'রে থাকতে হবে, এই চিন্তায় তিনি সারারাত ব্যাকুল হয়ে কাটালেন। বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতির সময়, চাল, ডাল, ফল প্রভৃতি নানা দ্রব্য সামগ্রী ভরতি একটি বড ঝুড়ি এনে একটি ছোট ছেলে পুরোহিতের স্ত্রীর হাতে দিযে বললে, "তোমার স্বামী কাল সকালেব আগে ফিরতে পারবেন না, তিনি এই ঝুড়িটি পাঠিয়েছেন। তোমার ও তোমার ছেলেমেয়েদের জন্য এটি আমি ব'য়ে এনেছি। কিন্তু তোমার স্বামী আমার কি করেছেন দেখ! এখানে পাঠাবার আগে তিনি আমার কপাল আঁচড়ে দিয়েছেন, এই দেখ দাগ।" এই ব'লে বালকটি অন্তর্হিত হ'ল। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় কষ্ট পেয়েছে—এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে পুরোহিত বাড়ী ফিরলেন এবং দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন, "প্রবল ঝড়ের জন্য বাড়ী ফিরতে পারিনি।" তাঁর স্ত্রী বললেন, "কেন, তুমি তো একটি ছোট ছেলেকে পাঠিযেছিলে। ছেলেটি আমাদের জন্য এক ঝুড়ি খাবার এনেছিল! খুব আনন্দে আমরা খেয়েছি। আচ্ছা, তোমার কি হয়েছে? ছেলেটির প্রতি এত নিষ্ঠুর হয়েছিলে কেন? তুমি তার কপাল আঁচড়ে দিয়েছিলে, সেখানে রক্ত ঝরছিল।" তখন পুরোহিতের হঠাৎ মনে উদয় হ'ল যে, ভগবান্ স্বয়ং তার প্রয়োজনীয় জিনিস বহন ক'রে এনেছেন! ভগবদ্গীতার যে ভাষ্য তিনি রচনা করছিলেন তাতে "বহাম্যহম্" শব্দটি তিনবার লিখেছিলেন, বহাম্যহম্, বহাম্যহম্, বহাম্যহম্—আমি বহন করি, আমি বহন করি, আমি বহন করি।

যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি,
ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥ ৪৮ ॥

যিনি কর্মফল ত্যাগ করেন, স্বার্থদুষ্ট সকল কর্ম ত্যাগ করেন এবং দ্বন্দ্বাতীত হন, (তিনি মায়া অতিক্রম করেন)।

কর্মসূত্র, কার্যকারণসূত্র শুধু যে বাহ্য জগতে কাজ করে তা নয়, নৈতিক এবং মানসিক জগতেও এই সূত্র কাজ করে। কর্মসূত্র বলে যে, আমি যদি তোমার জন্য কোন ভাল কাজ করি, ব তোমার বিষয়ে আমার যদি কোন প্রিয় চিন্তা থাকে, তাহ'লে আমি তার পুরস্কার পাব, তুমি নিজে সে পুরস্কার দাও বা না দাও, তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যদি ভাল কাজ করি, প্রতিদানে আমি ভাল ফল পাব। মন্দ যদি কিছু করি, প্রতিদানও মন্দ হবে। আমাদের সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয় আমাদের নিজ নিজ কর্ম ও চিন্তাদ্বারা। এটাই নিয়ম।

যতক্ষণ কর্মসূত্রে আবদ্ধ থাকা যায়, ততক্ষণ মুক্তি ও পূর্ণতা লাভ করা যায় না। আমাদের কাজ বা চিন্তা তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শুধু যে আমাদের সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করে তা নয়, তারা আমাদের মন ও প্রবণতার উপর রেখে যায় স্মৃতি, যার ফলে আমরা জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অধীন হয়ে থাকি।

কর্মসূত্র থেকে মুক্তিলাভের অর্থ এই নয় যে, সকল কর্ম সকল চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। কি কারণে আমরা কর্মসূত্রে আবদ্ধ হই? কর্ম ও কর্মফলের উপর আসক্তিই এর কারণ। তাই নারদ কর্মফল ও স্বার্থপর কর্ম ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এর রহস্য শিক্ষা দিয়েছেন :

"কেবলমাত্র কর্মের জন্যই তোমার কর্ম করবার অধিকার আছে, কর্মফলে তোমার কোন অধিকার নেই। কর্মফল প্রাপ্তির বাসনা যেন

কখনও তোমার কর্ম-প্রবৃত্তির কারণ না হয়। আবার অপর দিকে কাজ না-করার ইচ্ছাকেও কখনও প্রশ্রয় দিও না।

"ঈশ্বরে হৃদয় স্থির রেখে প্রত্যেক কর্ম কর। ফললাভে আসক্তি ত্যাগ কর।

"আত্মসমর্পণের প্রশান্তিতে তুমি পাপ-পুণ্যের বন্ধন থেকে নিজেকে ইহজন্মেই মুক্ত করতে পারো। অতএব ব্রহ্মসংযোগ লাভের জন্য আত্মনিয়োগ কর। ব্রহ্মের সহিত হৃদয়ের যোগ, তারপর কর্ম: এটাই নিষ্কাম কর্মের কৌশল।

"আত্মসমর্পণের প্রশান্তিতে মুনিগণ কর্মফল ত্যাগ করেন ও এইভাবে জ্ঞানলাভ করেন। তখন তাঁরা পুনর্জন্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সকল অমঙ্গল অবস্থার অতীত ব্রহ্মপদ লাভ করেন।"[১]

এরূপে ভক্তের সমগ্র জীবন হ'য়ে যায় অফুরন্ত সাধনাস্বরূপ। কারণ প্রত্যেক কাজ অনুষ্ঠিত হয় উপাসনারূপে, যেখানে ব্যক্তিগত লাভ বা সুবিধার আশা নেই।

অনেকের ধারণা—আসক্তিহীনতা ইঙ্গিত করে নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য অথবা অদৃষ্টবাদকে। বস্তুতঃ আসক্তিহীনতা নিষ্ক্রিয়তার ঠিক বিপরীত। ভগবদ্‌ভক্তিপ্রসূত এটা একটা ইতিবাচক গুণ। নিষ্কাম কর্ম ও নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে কার্য, কারণ, কর্ম ও পুরস্কারের চক্র থেকে ভক্ত নিজেকে মুক্ত করেন ও ব্রহ্মপদ লাভ করেন।

'যিনি দ্বন্দ্বাতীত হন (তিনি মায়া অতিক্রম করেন)।'

যতক্ষণ আমরা ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে থাকি ততক্ষণই শীত-গ্রীষ্ম, লাভালাভ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অনুভূত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় উপদেশ দিয়েছেন :

---

১ গীতা, ২।৫৭-৫৮ ও ৫০-৫১

"যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখকে অনুদ্বিগ্নচিত্তে গ্রহণ করেন এবং বিচলিত হন না, তিনি অমৃতত্ব লাভের অধিকারী।

"সাফল্য ও অসাফল্যের ফলশ্রুতিতে তোমার বুদ্ধিকে স্থির রাখবে। চিত্তের এই স্থৈর্যদ্বারা তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে।"[১]

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জীবনের এই বিপরীত ধর্মী অবস্থার মধ্যে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়? আমার গুরুদেব শিখিয়েছিলেন, "ঈশ্বরকে খুঁটি ক'রে ধ'রে থাকো।" ঈশ্বররূপ খুঁটিকে যদি ধ'রে থাকো, যত বড় ও যত চাপই আসুক না কেন, তোমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।

তা ছাড়া বড় রহস্য এই যে, 'আমি কর্তা' এই ভাব থেকে মুক্তি পেতে হবে। কিন্তু 'আমি ও আমার' বা 'আমি কর্তা' এই ভাব থেকে মুক্তি খুব উচ্চ অবস্থা।

যা হোক, সাধক যত বেশী ঈশ্বরচিন্তা করবেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রেম তত বাড়বে এবং তাঁর 'অহং'ভাব ক্রমশঃ তত কমে যাবে। তাই ঈশ্বর-রূপ খুঁটিকে ধরে থাকতে হয়।

যো বেদানপি সংন্যস্যতি, কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে ॥ ৪৯ ॥

যিনি শাস্ত্রীয় কর্ম ও অনুষ্ঠানাদিও ত্যাগ করেন এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিচ্ছিন্ন অনুরাগ লাভ করেন, তিনি মায়া অতিক্রম করেন।

যতদিন না আমাদের হৃদয়ে পরাভক্তির উদয় হয়, ততদিন পর্যন্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলতে হয় ও আধ্যাত্মিক সাধনা অভ্যাস করতে হয়। বলা হয়েছে যে, পরাভক্তি লাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অভিন্ন. এর অর্থ এই

১ গীতা. ২।১৫ ও ৫৩

যে, তখন ভক্ত অশেষ আনন্দময় চেতনার ভিতর বাস করেন। তখন তাঁর শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলার আর কি প্রয়োজন?

সঃ তরতি সঃ তরতি সঃ লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০ ॥

এইরূপ ভক্ত নিশ্চয়ই মায়ামুক্ত হন এবং অপরকেও মায়ামুক্ত হইতে সাহায্য করেন।

উপরিউক্ত তিনটি সূত্রে আধ্যাত্মিক সাধনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কিরূপ আধ্যাত্মিক সাধনা তাঁকে করতে হবে।

"হে কৌন্তেয়, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠারূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে যতি কি প্রকারে সিদ্ধিলাভ করেন, তা আমার নিকট শ্রবণ কর। যখন হৃদয় ও মন মায়ামুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয়, যখন স্থির বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা হয়, আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন ক'রে যখন শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করা হয়, যখন তিনি নির্জনে বাস করেন, পরিমিত আহার করেন, বাক্য, মন ও শরীর সংযত করেন, যখন তিনি ধ্যাননিষ্ঠ হন ও বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, যখন তিনি অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অধিকৃত বস্তু ত্যাগ করেন ও সকল বিষয়ে মমতা-বর্জিত হন, যখন তাঁর হৃদয় প্রশান্ত হয়, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপতালাভের যোগ্য হন। ব্রহ্মস্বরূপতা-প্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা সেই যতি কোন বিষয়ে শোক করেন না, সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এরূপ যতি আমার প্রতি উত্তম ভক্তি লাভ করেন।"[১]

এভাবে সাধনা করলে সাধক পরাভক্তি লাভ করেন এবং সতত জ্ঞানালোকে বাস করেন। আলোকপ্রাপ্ত হৃদয় মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এরূপ ব্যক্তিই কেবল শাশ্বত আনন্দ উপলব্ধি করেন। তিনি

১ গীতা, ১৮।৫০—৫৪

প্রকৃত গুরু হন এবং অপরকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেন।

৩৯—৪২ সংখ্যক সূত্রগুলি ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই সূত্রগুলিতে নারদ গুরুর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে ভক্ত গুরুকৃপায় মায়ামুক্ত হন।

তা ছাড়া, এরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি 'সমগ্র জগৎকে পবিত্র করেন।' এটা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের কথা। এক দিন আমার গুরুদেব তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী প্রেমানন্দের বিষয়ে আমাকে বলেন, "তুই কি জানিস্ তিনি কত বড় মহাপুরুষ! কিরূপ পবিত্রতা তাঁর ভিতর থেকে নিঃসৃত হয়! তিনি যে দিকে তাকান সে দিকটাই পবিত্র হ'য়ে যায়।" শ্রীরামকৃষ্ণের এই সকল শিষ্যের তিরোধানের পর অনেক বছর গত হয়েছে, এখনও যখনই আমি তাঁদের কথা চিন্তা করি, তখনই আমার মনে হয় যে, আমি পবিত্র হয়েছি, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসও পবিত্র হয়েছে।

বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের কথা বলার বা উপদেশ দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। চিন্তা সংক্রামক, পবিত্রতাও সংক্রামক। এমন কি একজন পবিত্র ব্যক্তি যদি ঘরের ভিতর দ্বার বন্ধ ক'রে ব'সে থাকেন, তাহলেও তাঁর জীবন, তাঁর পবিত্রতা, তাঁর ভগবৎ-প্রেম সমগ্র মানবজাতিকে সাহায্য করে; এই সাহায্য পান তাঁরা, যাঁরা গুরুকৃপা লাভের জন্য হৃদয়দ্বার খুলে রাখেন, যাঁরা আগ্রহের সহিত আধ্যাত্মিক ফললাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন। শুদ্ধতা ও পবিত্রতার চিন্তারাশি আকাশে বাতাসে ছড়ানো রয়েছে; খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য অনেক মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী যদিও এখন এ জগতে স্থূল দেহ ধারণ ক'রে বাস করছেন না, তবু তাঁরা এখনও মানব জাতিকে সাহায্য করছেন,—পথনির্দেশ করছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক ও পরাভক্তি

অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৫১ ॥

মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২ ॥

প্রেমের স্বরূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ইহা বোবা ব্যক্তির রসাস্বাদনের অনুভব প্রকাশ করিবার চেষ্টার মতো।

২৫ ও ৩০ সংখ্যক সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, নির্বিকল্প সমাধিতে প্রেম বা পরাভক্তির যে উপলব্ধি হয়, তা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব।

একদিন কয়েকজন শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে চরম উপলব্ধি বর্ণনা করবার জন্য অনুরোধ করলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বর্ণনার চেষ্টা করামাত্র সমাধিমগ্ন হলেন। যতবার তিনি এই চেষ্টা করলেন, প্রত্যেক বার তাঁর ঐরূপ অবস্থা হ'ল এবং তিনি সম্পূর্ণ নীরব থাকলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল, কত গভীর জল তার খবর দিতে। খবর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খবর দিবে।"

নারদ বোবা লোকের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, বোবা ব্যক্তি যেমন রস-আস্বাদনের উপলব্ধির বিষয় বাক্যদ্বারা প্রকাশ করতে পারে না, সেইরূপ প্রেম বা পরাভক্তি কেবল অনুভব করা যায়, বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

উপনিষদে একটি যুবকের গল্প আছে। যুবকটিকে তার পিতা পাঠিয়েছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করতে। প্রথমবার যুবকটি ফিরে এলে তার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শিখেছ?" যুবকটি ব্রহ্মের বিষয়ে সুন্দর একটি আলোচনা করলেন। পিতা তখন পুত্রকে আরও কিছু শিখবার জন্য ফিরে যেতে বললেন। দ্বিতীয় বার যুবকটি ফিরে এলেন এবং তার পিতা সেই একই প্রশ্ন করলেন, যুবক তখন নীরব থাকলেন। পিতা আনন্দিত হ'য়ে বললেন, "হাঁ বাবা, ব্রহ্মজ্ঞের মতো তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তুমি তাঁকে উপলব্ধি করেছ। সেখানে পূর্ণ নীরবতা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মৌমাছির উপমা দিয়ে বলতেন যে, মৌমাছি যতক্ষণ না ফুলের উপর বসে, ততক্ষণ সে শব্দ করে। ফুলের উপর বসে মধু পান করলে সে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও মধুপানে মত্ত হ'য়ে মৌমাছি মিষ্টস্বরে গুন্ গুন্ করে। ঐরূপ ভগবৎ-প্রেম-সুধা পান ক'রে মত্ত হ'য়ে কেউ কেউ ভগবৎ-কথা নানাভাবে বলেন বটে, কিন্তু তাঁদের অন্তরের অনুভূতি কখনও প্রকাশ করতে পারেন না।

প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩ ॥

(অনির্বচনীয় হইলেও) এই প্রেম লাভ করিয়াছেন—এইরূপ মহাপুরুষে এই প্রেম প্রকাশ পায়।

মহাপুরুষগণ কর্তৃক উপলব্ধ সেই পরাপ্রেমের, একত্ব-বোধের অনুভূতি বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না সত্য, তবুও মহাপুরুষগণের অনুকরণীয় জীবন সাধকের পক্ষে পথপ্রদর্শক-স্বরূপ। এইসকল মুক্তপুরুষের সংসর্গে সাধক অনুভব করতে পারেন, কিরূপ আনন্দময় চেতন অবস্থায় তাঁরা বাস করেন, কিভাবে তাঁদের প্রেম সর্ব জীবের প্রতি প্রবাহিত হয়। আমার গুরুদেবের সান্নিধ্যে আমরা সকলে আমাদের ভিতর অনুভব

করতাম এক আনন্দের প্রবাহ; তিনি আমাদের দেখিয়ে দিতেন ভগবদ্-উপলব্ধি কত সরল ও সহজ। ঈশ্বর যেন আমাদের করতলে ধৃত একটি ফল। তিনি আমাদের অনুভব করাতেন যে, ঈশ্বর আমাদের নিকটতম থেকেও নিকটতর, আমাদের প্রিয়তম থেকেও প্রিয়তর। এইভাবে এই সকল মহাপুরুষ সাধকদের মধ্যে ঈশ্বরের সত্য নীরবে সংক্রামিত করেন।

শঙ্করাচার্য একটি চিত্র দিয়েছেন: গুরুদেব বৃক্ষতলে নীরবে উপবিষ্ট, তাঁর বয়স কম; তাঁকে ঘিরে শিষ্যগণ উপবিষ্ট—তাঁরা বৃদ্ধ; তাঁরাও নীরব। ক্রমশঃ শিষ্যদের সংশয় দূরীভূত হ'ল এবং ভগবৎ-সত্য উদ্ঘাটিত হ'ল।

গুরুদেব অল্পবয়স্ক, কারণ ভগবৎসত্য চির নূতন ও শাশ্বত। শিষ্যগণ বৃদ্ধ, কারণ কুসংস্কার ও অজ্ঞতা অনাদি কাল থেকে বর্তমান।

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানম্
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরম্ অনুভবরূপম্ ॥ ৫৪ ॥

এই প্রেম গুণরহিত, ইহা সকল প্রকার স্বার্থপর বাসনা-মুক্ত। ইহা অনুক্ষণ বর্ধনশীল, ইহা অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মতম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপলব্ধি।

প্রেম আত্মা বা ব্রহ্মের যথার্থ প্রকৃতি, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান্ প্রেম-স্বরূপ, অতএব গুণরহিত। মানুষের হৃদয়ে এই প্রেমের উদয় হ'লে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তিনি একত্ব অনুভব করেন। সাধারণ মানবিক প্রেমে দেখা যায় প্রেমিক প্রেমাস্পদের ভিতর কয়েকটি গুণ দেখতে পায় ব'লে তার প্রতি প্রেমের উদয় হয়। কিন্তু এই ভগবৎ-প্রেমে, প্রেমের ফল প্রেম ছাড়া আর কোন কারণ থাকে না।

এই প্রেম হ'লে মানুষের পরমপ্রাপ্তি, পূর্ণতালাভ। স্বার্থজনিত সর্ববিধ বাসনা তখন কাঁচখণ্ডের ন্যায় মূল্যহীন বোধ হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আমাদিগকে বাসনা-মুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিতেন, যাতে আমরা ঈশ্বরের সহিত পূর্ণ মিলনে সিদ্ধিলাভ করি।

মহাপুরুষগণের ভিতর একটি মাত্র বাসনা অবশিষ্ট থাকে, অবশ্য যদি তাকে বাসনা বলা যায়। তাঁদের হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ, তাই তাঁদের একমাত্র বাসনা যে, মানবজাতির সকলেই যেন 'বোধাতীত শান্তি' আনয়নকারী এই প্রেম লাভ করে।

এই প্রেম গভীরতায় অনুক্ষণ বৃদ্ধি পায়। আমার গুরুদেব বলতেন, "আলো, আরও আলো, আরও আলো। এর কি কোন শেষ আছে?"

একজন শিবের ভক্ত সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক পৌরাণিক গল্প আছে। ভারতবর্ষে শিব-বিগ্রহের নিকট একটি ষাঁড়ের মূর্তি দেখা যায়। গল্পে আছে যে, ঐ ষাঁড়টি মহাদেবের এক পরম ভক্তের প্রতীক। এই ভক্তের প্রেম বর্ধিত হয়ে এরূপ গভীর হয়েছিল এবং তিনি আনন্দে এত বেশী উৎফুল্ল হয়েছিলেন যে, তাঁর মানবদেহ সে আনন্দ ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। সেই গভীর প্রেম ও আনন্দধারণে সমর্থ হ'যে শান্ত থাকার জন্য তিনি এক শক্তিশালী ষাঁড়ে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

এই প্রেম অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্মতম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উপলব্ধি।

ভক্ত সর্বক্ষণ অবিচ্ছিন্নভাবে আনন্দে ও মাধুর্যে মগ্ন থাকেন। একদিন এক নবীন সাধক স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি ঘুমোন না?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি ঘুমোই, কিন্তু তোমাদের মতো নয়।" অর্থাৎ ঘুমোবার সময়েও তিনি অন্তরে সেই আনন্দ অনুভব করতেন। এই আনন্দ সূক্ষ্মতম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, কারণ এ আনন্দ কেবল-মাত্র অনুভব করা যায়, কিন্তু বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। একে প্রকাশ করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না, কারণ এ অনুভূতি সচ্চিদানন্দের অনুভূতি।

তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি,
তদেব ভাবয়তি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥

ভক্ত যখন এই প্রেম লাভ করেন, তখন তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদকে সর্বত্র দর্শন করেন, সর্বত্র তাঁহার বিষয় শ্রবণ করেন, কেবল তাঁহার কথাই বলেন ও তাঁহাকে চিন্তা করেন।

বস্তুতঃ তিনি তাঁর প্রেমাস্পদ ইষ্টের সহিত অবিরত যুক্ত থাকেন। তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ করেন এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু দর্শন করেন না। এই আপাতপ্রতীয়মান বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে তিনি দর্শন করেন একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে। এইরূপ ব্যক্তি সকল জীব ও প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন।

প্রকৃতপক্ষে আমরা ব্রহ্মের উপর নামরূপের জগৎ আরোপ ক'রে সর্বক্ষণ তাঁকেই উপলব্ধি করছি। বস্তুতঃ এই জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়; কিন্তু মায়ার কুহকে আবদ্ধ থাকার জন্য আমরা তা জানতে পারি না। দিব্যদৃষ্টি উন্মীলিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বাহ্য দৃষ্টি দিয়ে আমরা দেখতে পাই শুধু জড় ও বাহ্য বস্তুকে। জ্ঞানী ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সর্বত্র ও সর্ব পরিবেশে কেবলমাত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন।

সর্বত্র তাঁর বিষয় শ্রবণ করেন।

যে শব্দ তিনি শোনেন, তা তাঁকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হ'য়ে বলেছিলেন: মাগো! বর্ণমালার সব অক্ষরই যে তুমি! বেদেও তুমি আছ, আবার আছ সেই সব শব্দেরও মাঝে, যা শোনা অনুচিত ও অশ্লীল।

ভাল ও মন্দ আবরণের পিছনে কেবল একটি মাত্র আলোক জ্ঞানীর হৃদয়ে দৃশ্যমান হয় এবং সেটি তাঁর প্রেমাস্পদের আলোক।

'তিনি কেবল তাঁর কথাই বলেন ও তাঁকেই চিন্তা করেন।'

শঙ্কর বলেছেন, "পরমানন্দের অনুভূতি অগ্রাহ্য ক'রে সামান্য বাহ্য বস্তুতে কি জ্ঞানী ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? চন্দ্র যখন তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে শোভা পায় তখন চন্দ্রের ছবি কে চায়?"[১]

তারপর তিনি ঈশ্বরময় জীবন কি-ভাবে যাপন করতে হয়, সে বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, "অসত্যের উপলব্ধি আমাদের সন্তোষ দান করতে পারে না, দুঃখ-কষ্টের কবল থেকে মুক্তও করতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের মধুর আনন্দ-উপলব্ধিতে তৃপ্ত হও। আত্মাতে অনুরক্ত হ'য়ে চিরদিন সুখে বাস কর।

"হে মহাত্মা, এইভাবে তোমাকে দিন যাপন করতে হবে—আত্মাকে সর্বত্র দেখবে, আত্মার আনন্দ উপভোগ করবে, আত্মা—যাঁর দ্বিতীয় নেই, সেই আত্মার উপর তোমার চিন্তা নিবদ্ধ করবে।"[২]

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্তাদি ভেদাদ্ বা ॥ ৫৬ ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটির যে কোন একটি গুণের মনের উপর প্রাধান্য ভেদে এবং সংসারে বীতরাগ, জ্ঞানান্বেষক ভক্ত ও ঐহিক কামনা পূরণে অভিলাষী ভক্তের ঈশ্বরানুরাগের কারণ ভেদে প্রাথমিক ভক্তি তিন প্রকার।

পূর্ববর্তী কয়েকটি সূত্রে পরাভক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভক্ত যখন গুরু ও ঈশ্বরের কৃপার মাধ্যমে পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি তখন তিন গুণের অতীত হন, স্বার্থ-দুষ্ট কামনা থেকে মুক্ত হন, সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং অন্তরে অবিচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন।

পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান কেবল আধ্যাত্মিক সাধনাদ্বারা উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হয়। কোন কোন মহাপুরুষ পরাভক্তি

১ বিবেকচূড়ামণি, ৫২২
২ বিবেকচূড়ামণি, ৫২৫-৫২৪

নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা চিরপবিত্র, চিরমুক্ত। এই জ্ঞান ও ভক্তি সঙ্গে নিয়ে অবতারগণ জন্মগ্রহণ করেন, আর করেন তাঁদের কয়েকজন শিষ্য, যাঁরা ঈশ্বরকোটি। কিন্তু সাধারণ লোককে জ্ঞান ও ভক্তি লাভের জন্য কঠোর সাধনা করতে হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভক্তির অর্থ প্রাথমিক ভক্তি এবং ভক্তিলাভও। আলোচ্য সূত্রে আবার বলা হচ্ছে যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা তাঁদের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুযায়ী ভক্তি-সাধনা করেন। প্রথম সূত্রে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঈশ্বরে অনুরক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছেন—এক শ্রেণীর মানুষের সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মেছে, এক শ্রেণী জ্ঞান অন্বেষণ করছেন ও আর এক শ্রেণীর লোকের বাসনা পূর্ণ হয়নি ও সেজন্য তাঁরা ঈশ্বরের সাহায্যপ্রার্থী। সব শেষে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হযেছে যে, জ্ঞানী সদসৎ বিচারশীল। জ্ঞানীর বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন। সংসারের সকল বস্তুর অসারতার বিষয় তাঁরা অবগত আছেন, ভালবাসার জন্যই তাঁরা ঈশ্বরকে ভালবাসেন। এই শ্রেণী সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "তাঁরা আমার আত্মস্বরূপ।" এরূপ ভক্ত পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিকটতম অবস্থায় পৌঁছেছেন।

৫৬ সংখ্যক সূত্রে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের একটির অথবা অপরটির প্রাধান্য অনুযায়ী এই ভাগ করা হযেছে।

সাত্ত্বিক ভক্ত ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর একমাত্র আদর্শ—সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি ও ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ লাভ। তাঁর হৃদয়ের একমাত্র প্রার্থনা, ঈশ্বরের জন্য পবিত্র প্রেম ও তাঁর জ্ঞান লাভ করা।

রাজসিক ভক্ত ঐহিক উদ্দেশ্য, যথা—সফলতা, স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য লাভের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হন।

রাজসিক ভক্তের ন্যায় তামসিক ভক্তও এখন পর্যন্ত শাশ্বত ও অশাশ্বত বস্তু বিচার করবার মতো অবস্থায় পৌঁছাননি। সাধারণভাবে বলা

যেতে পারে, তামসিক ভক্ত 'ধার্মিক'; অর্থাৎ তাঁর ধর্ম খ্রীষ্টানদের রবিবারের ধর্মের মতো। তিনি নিয়মিত গীর্জায় যান, অর্থ সংগ্রহ করার বাক্সে টাকা পয়সা রাখেন, একটু প্রার্থনা করেন, গীর্জার গায়ক দলের সঙ্গে ঈশ্বরের নামগুণগান করেন। জীবনের উদ্দেশ্য কি, তা তিনি ভাল ভাবে জানেন না—বোঝেনও না।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজসিক ভক্তপর্যায়ে পৌঁছাবার জন্য তামসিক ভক্তি একটি ধাপ। শেষ পর্যন্ত ভক্ত সাত্ত্বিক পর্যায়ে উপনীত হন।

ঈশ্বরানুরাগ কিভাবে আরম্ভ হ'ল, তাতে কিছু যায় আসে না। এমন কি ছোট একটি প্রার্থনা, সামান্য কিছু ঈশ্বর-চিন্তাও ক্রমশঃ পরম লাভের দিকে নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতেন। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ভক্ত প্রেমাস্পদ ইষ্টকে সর্বত্র দর্শন করেন; এই বৈচিত্র্যময় জগতে ঈশ্বর বহুরূপ ধারণ করেছেন অথবা বহুরূপে তিনি প্রত্যক্ষ হয়েছেন। এই শ্রেণীর ভক্ত জগৎকারণ ব্রহ্মে যেমন ঈশ্বর দর্শন করেন, সেইরূপ একটি তৃণেও ঈশ্বর দর্শন করেন। মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত নিজ হৃদয়-মন্দিরে ঈশ্বর দর্শন করেন এবং জানেন যে, তিনিই প্রভু, তিনিই সাক্ষী। অধম ভক্ত উপরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ঈশ্বর ঐ হোথা হোথা" অর্থাৎ ঈশ্বর আকাশের উপর আছেন।

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭ ॥

এই তিন শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে প্রথম শ্রেণী শ্রেষ্ঠ, তার পরের শ্রেণী মধ্যম ও তারও পরের শ্রেণী অধম।

একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, এঁদের সকলেই শেষ পর্যন্ত প্রেম বা পরাভক্তি লাভ করবেন। কারণ যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হও। এই অনুরক্ত হওয়াই তাঁর দিকে যাবার প্রথম ধাপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভগবৎপ্রেমের রূপ

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্য সব পথ অপেক্ষা ভক্তিপথ সহজ।

ভক্তিপথ সহজতম, কারণ প্রত্যেকের হৃদয়ে ভালবাসা আছে। ভালবাসার সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না; কিন্তু ভালবাসা অনুভব করা যায় এবং হৃদয়মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। পিতা-মাতা সন্তানদের ভালবাসে, সন্তান পিতামাতাকে ভালবাসে; স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা থাকে, বন্ধুদের মধ্যেও ভালবাসা থাকে। ভালবাসা যে-রূপেই থাকুক, এর প্রকৃতি স্বর্গীয়। আমরা পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ অনুভব করি, সে আকর্ষণ ঈশ্বরের—যিনি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজিত আছেন; আমরা কিন্তু এ-বিষয়ে অবগত নই। সেইজন্য যে-কোন ব্যক্তি ভক্তিপথ সহজে অনুসরণ করতে পারে; শুধু প্রয়োজন, তার প্রেমকে জ্ঞাতসারে ভগবন্মুখী করা। প্রহ্লাদের একটি সুন্দর প্রার্থনা আছে: "হে প্রভু, সংসারী জীবের সংসারের বস্তুর প্রতি যেরূপ ভালবাসা, তোমার প্রতি সেইরূপ ভালবাসা যেন লাভ করতে পারি।" সত্যস্বরূপ ঈশ্বর, যাঁর প্রকৃতি প্রেম, তাঁর অভিমুখে যখন আমাদের এই প্রেমকে ঘুরিয়ে দিই, তখনই প্রেম তার পরিণতি লাভ করে। গরমের দিনে সমুদ্রের নিকটবর্তী হ'লে সমুদ্রের শীতল বাতাস যেমন অনুভব করা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকটবর্তী হ'লে সাধক তাঁর প্রেম অনুভব করতে আরম্ভ করেন।

ভগবৎপ্রেম অনুভব করতে আরম্ভ করলে, তাঁর প্রতি সাধকের প্রেমের গভীরতাও বৃদ্ধি পাবে। তখন সাধক তাঁর সর্ব হৃদয়, অন্তঃকরণ, মন ও শক্তি দিয়ে ভগবৎপ্রেম শিক্ষা করবেন ও সবিকল্প সমাধিতে ঈশ্বরের দর্শনও লাভ করবেন। অবশেষে নির্বিকল্প সমাধি লাভ ক'রে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হবেন। নাহং, নাহং, তুঁহু, তুঁহু। সেই পুরানো 'আমি' আর নেই, এখন আছে শুধু 'তুমি'। 'আমিই তুমি'।

প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥
শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০ ॥

প্রেম নিজেই প্রমাণস্বরূপ বলিয়া তাহার আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। ইহার প্রকৃতি শান্তি-স্বরূপ ও পরমানন্দ-স্বরূপ।

প্রেম অনুভব করা যায় ও নিজ হৃদয়ে এই প্রেম উপলব্ধি করা যায়। প্রেমই প্রেমের প্রমাণ।

প্রেমের প্রকৃতি শান্তি ও পরমানন্দ; শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করা যায় যখন ভক্ত ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হন। মানবিক প্রেমে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সে শান্তি ও আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। ভগবদ্‌ভক্তি দ্বারা যে শান্তি ও আনন্দ উপলব্ধি করা যায়, তা স্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন এবং ক্রমশঃ তার গভীরতা বর্ধিত হয়।

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ ॥৬১॥

নিজেকে, নিজের বলিতে সব কিছু বস্তুকে, এমন কি শাস্ত্রীয় আচারাদিকেও ভক্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন, তাই তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য শোক করেন না।

বস্তুতঃ ভক্ত মনে করেন না যে, তাঁর নিজের বলতে কোন বস্তু এ জগতে আছে। তিনি নিজেকে ইষ্টে সমর্পণ করেছেন। নারদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আত্মসমর্পণই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ সীমা। ঈশ্বরে এবং ঈশ্বরেচ্ছায় আত্মসমর্পণের জন্য আমরা সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক সাধনা অভ্যাস করি। হে প্রভু, তুমি আমার একমাত্র আশ্রয়, আমি তোমার, আমি তোমার, তুমি আমার আপনার, একান্ত আপনার। এইভাবে ভক্ত হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ হয়। লাভ-ক্ষতির কথা আর মনে থাকে না।

তাঁর হৃদয় সর্বদা ঈশ্বরীয় আনন্দে পূর্ণ থাকে। শাস্ত্রীয় আচারাদি তখন প্রায় আর থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়, ওঁকার লয় হয় সমাধিতে।

ন তৎ সিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্যমেব ॥ ৬২ ॥

ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও ভক্তের লৌকিক কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, কিন্তু ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণপূর্বক তিনি কর্ম করিবেন।

কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা ঈশ্বরলাভ করেছিলেন, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা দেখেছিলেন সেই এক ঈশ্বর, সেই আনন্দময় চেতনা সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছে। তবু আমরা দেখতে পাই, তাঁরা উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা প্রচার করেছিলেন। যারা ক্লান্ত, যারা ভারাক্রান্ত, যারা ঈশ্বরকে জানে না, সেইসব ব্যক্তিদের জন্য তাঁদের হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ হয়েছিল এবং সেই সহানুভূতিই তাঁদের নামিয়ে

এনেছিল সর্বোচ্চ ভাব-ভূমি থেকে। অজ্ঞানের অন্ধকারে বাসকারী মানবজাতির কল্যাণের জন্য তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন :

"আমার বিষয় চিন্তা কর : ত্রিভুবনে আমার কর্তব্য কিছু নেই ; এমন কোন বস্তু নেই যা আমার নেই, আমার আর পাবারও কিছু নেই। তা'সত্ত্বেও আমি কাজ করে চলেছি। আমি যদি কাজ না করি, তাহ'লে মানুষও আমাকে অনুসরণ করবে—কেউ কিছু করবে না, আমি যদি কাজ না করি তাহ'লে জগৎ বিনষ্ট হবে।"[১]

আমার গুরুদেব 'মহারাজ' একদিন আমাকে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে খেলতে দেখেছি, কতকগুলি মুখোস পরে খেলছেন, সাধুর মুখোস, পাপীর মুখোস, সৎলোকের মুখোস, চোরের মুখোস। তাহ'লে কি ক'রে অপরকে শিক্ষা দিতে পারি? কিন্তু সেই উপলব্ধি-ভূমি থেকে নামবার পর তোদের ভুল নজরে পড়ে এবং তা সংশোধন করবার চেষ্টা করি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, লোক-শিক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ 'বিদ্যার আমি' রেখে দেন। এ 'আমি' স্পর্শমণির মতো, স্পর্শমণির স্পর্শ পেলে লোহার তরবারি সোনা হ'য়ে যায়। তখন তা দিয়ে কারো অনিষ্ট হয় না।

স্ত্রী-ধন-নাস্তিক [বৈরি-] চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

কাম, কাঞ্চন ও নাস্তিকতার বিষয়ে আলোচনা শ্রবণ করা উচিত নয়।

এই সূত্রে এবং পরবর্তী তিনটি সূত্রে নারদ বলেছেন, পরাভক্তির জন্য আমাদের কি কি বস্তু পরিহার করা উচিত। পূর্ববর্তী এক সূত্রে তিনি অসৎ-সংসর্গ পরিহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এখানে তিনি বলছেন

১ গীতা, ৩।২২-২৪

যে, কামাসক্ত, অতিলোভী ও ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন ব্যক্তিদের সংসর্গ তো পরিহার করতে হবেই, এমনকি তাদের বিষয়ে আলোচনা শোনাও চলবে না। এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম শিক্ষার্থীদের জন্য।

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

অভিমান, দম্ভ ও অনুরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন—"মানুষের অন্তরে পূর্ব হইতেই নিহিত দেবত্বের বিকাশ।" পূর্ণতা বা দেবত্বই প্রতি জীবের যথার্থ প্রকৃতি। প্রতি মানুষের ভিতর দেবত্ব প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কিন্তু অজ্ঞতার গ্রন্থি ও আবরণ দিয়ে তার দরজা বন্ধ। এই অজ্ঞানের প্রকৃতি কি? প্রথমতঃ অজ্ঞান অন্তর্যামী ঈশ্বরকে—সেই সচ্চিদানন্দকে ঢেকে রাখে, তারপর শুদ্ধ অন্তর্যামী ঈশ্বরের সঙ্গে মন, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতিকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ক'রে অহংকারের সৃষ্টি করে। এই অহংকারের ভাব থেকে উদয় হয় প্রিয়বস্তু ও ব্যক্তিদের প্রতি আসক্তি এবং দুঃখ ও যন্ত্রণা-দায়ক বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন:

"বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গণ যে আকর্ষণ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তা স্বাভাবিক। তুমি কিন্তু তাদের বশীভূত হবে না, কারণ তারা ভগবান্-লাভের বাধাস্বরূপ।"[১]

তা'ছাড়া বাহ্য জীবনকে জড়িয়ে ধ'রে থাকার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। খ্রীষ্ট বলেছেন, "যে জীবন বাঁচাবে, তাকে জীবন হারাতে হবে।"[২] এই বাহ্য জগতের ভেতরে আছে ঈশ্বরীয় জীবন, যা শাশ্বত।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কাকেও ভালবাসব না, অথবা সাংসারিক

১ গীতা, ৩।৩৪

২ For whosoever will save his life shall lose it.

সকল বিষয়ে উদাসীন থাকব এবং জাগতিক সকল রকম কর্ম থেকে বিরত থাকব।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন :

"সংযতচিত্ত পুরুষের আসক্তি নেই, বিদ্বেষও নেই। আসক্তি ও বিদ্বেষের বিষযবস্তুর মধ্য দিয়ে তিনি নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে পারেন। তিনি চির-প্রসন্নতা লাভ করেন। স্বচ্ছ প্রসন্নতায় তাঁর সর্ব দুঃখ লয় পায়, তাঁর প্রসন্নচিত্ত শীঘ্র শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অসংযত মন আত্মার উপস্থিতি অনুমানও করতে পারে না, কিভাবে সে ধ্যান করবে? ধ্যান ব্যতীত শান্তি কোথায়? শান্তি না থাকলে সুখ কোথায়?"[১]

'আমি'-ভাব মনকে চঞ্চল ও অসংযত করে। 'আমি'-ভাব থেকে উদয় হয় অহংকার, দম্ভ ও নাম যশের আকাঙ্ক্ষা। অজ্ঞান দূর করার পথে এরা বিরাট বাধাস্বরূপ।

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে যার অর্থ : "অহংকার সুরাপানের মতো গর্হিত, যশ নরকের দ্বারস্বরূপ এবং প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা। হে মানব, এই তিনটি দোষ পরিহার কর ও সুখী হও।"[২]

ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে স্বামী বিবেকানন্দ প্রভূত নাম-যশ ও সম্মান পেয়েছিলেন। মহারাজের এক শিষ্য স্বামী অম্বিকানন্দ স্বামীজীকে অন্তরঙ্গভাবে জানতেন। তিনি একবার আমাকে লিখেছিলেন যে, তিনি দেখেছেন, স্বামীজী পরিবেশসম্পর্কে সম্পূর্ণ বেহুঁস হয়ে ভাবাবেগে বেলুড় মঠের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াত করছেন ও বার বার আবৃত্তি করছেন উপরের ঐ সংস্কৃত শ্লোকটি।

'আমি'-বোধ যে সর্বক্ষেত্রেই মন্দ, তা নয়। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে

১ গীতা, ২।৬৪-৬৬

২ অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবম্।
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ।

যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখে দেন। আধ্যাত্মিক সাধককেও একটা 'আমি' রেখে দিতে হয়, যাতে তিনি তার পারে যেতে পারেন ; তাই তাঁর জন্য রয়েছে 'বিদ্যার আমি', যার প্রেরণায় তিনি ঈশ্বরকে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁকে ভালবাসতে চান। সাধককে অনুভব করতে হবে যে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান ; তিনি ঈশ্বরের সেবক। সংক্ষেপে বলা যায়, যে-'আমি' আমাদের ঈশ্বর বা অন্য বস্তু থেকে পৃথক করে, যে-'আমি' দাম্ভিক, ঈর্ষান্বিত ও সংশয়ী, যে-'আমি' স্বার্থান্বেষী, সে-'আমি' অবিদ্যার 'আমি'। এই 'আমি'কে জয় ক'রে সাধককে ঈশ্বর-উপলব্ধি করতে হবে।

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

তোমার সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর এবং কাম, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি তোমার সকল রিপুকে ঈশ্বরাভিমুখী কর।

হোম-অনুষ্ঠানে ব্রহ্ম ও শক্তিকে অগ্নির ভিতর আবাহন করা হয়। অগ্নির মধ্যে ব্রহ্ম ও শক্তি উভয়েই উপস্থিত আছেন—এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে আহুতি অর্পণ ও মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হবার পর কর্মফলসহ ভাল ও মন্দ কর্ম নিম্নলিখিত প্রার্থনাসহ ঈশ্বরে উৎসর্গ করা হয় :

"বুদ্ধি, প্রাণবায়ু ও তাদের সর্ববিধক্রিয়াবিশিষ্ট দেহধারী জীব আমি, আমার সমস্ত কর্ম ও তার ফল এখন ব্রহ্মাগ্নিতে অর্পণ করছি। আমার মন, জিহ্বা, হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দ্বারা জাগরণে, স্বপ্নে, সুষুপ্তিতে যা করেছি, বলেছি ও ভেবেছি, তা যাই হোক না, সে সবই ব্রহ্মে সমর্পণ করছি।"

সাধক তাঁর সকল কর্ম ও কর্মফল মনে মনে ঈশ্বরে সমর্পণ করাকে

দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবেন। এইরূপ অভ্যাস তাঁর হৃদয়কে পবিত্র করবে এবং যে-সব কর্ম ঈশ্বর-দর্শনের বাধাস্বরূপ, সাধক ক্রমশঃ সেইসব কর্ম থেকে বিরত হবেন। তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাস ও প্রেম বর্ধিত হবে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কামক্রোধাদি রিপু আছে। এই রিপুগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করার জন্য মহান্ আচার্যগণ সাধকদের প্রায়ই উপদেশ দেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা পাঠ করি, "ঈশ্বরের সহিত একত্বের এবং তাঁর প্রতি ভক্তির মনোভাব নিয়ে যিনি কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করেন, তিনি ঈশ্বরে পরিণত হন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দের বয়স তখন খুব কম ছিল। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে এসে অনুরোধ করলেন তাঁকে কাম-জয়ের জন্য সাহায্য করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "কাম জয় করতে চাস্ কেন? বরং বাড়িয়ে দে।" শিষ্য তখন কাম বাড়ানোর অর্থ ভালভাবে বুঝতে পারলেন, কাম বাড়াতে হবে ভগবানের জন্য, তাঁকে সমগ্র হৃদয় দিয়ে কামনা করতে হবে।

এইভাবে ক্রোধেরও মোড় ফিরাতে হবে ভগবানের দিকে। "হে প্রভু, তুমি কি আমাকে দেখা দেবে না? তুমি কি নিষ্ঠুর! আমি অসহায়; আমার হৃদয় শুকিয়ে গেছে। কেন তুমি আমাকে কৃপা ক'রছ না, কেন তুমি তোমার অবিচল প্রেম আমাকে দিচ্ছ না?" অথবা ভক্তিলাভে যে-সকল বস্তু বাধা দেয়, সেগুলির দিকে ক্রোধের মোড় ফেরানো যেতে পারে।

"আমি ঈশ্বরের সন্তান", "আমি ঈশ্বরের সেবক" এরূপ অহংকার হৃদয়ে পোষণ করলে ক্রমশঃ ঈশ্বরের বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং তখন সাধকের 'আমি' ঈশ্বরেতে লয় পায়। এইরূপে রিপুগুলি ভগবন্মুখী হ'লে, সেগুলি ভগবদ্-ভক্তি লাভের সহায়ক হয়।

ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তাত্মকং বা প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যম্ ইতি ॥ ৬৬ ॥

তিন প্রকার ভক্তি পার হইয়া নিজেকে ইষ্টের নিত্যদাস বা নিত্যকান্তা ভাবিয়া তাঁহার উপাসনা কর।

পরাভক্তিলাভের জন্য ভক্ত তিনভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে। একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিনপ্রকার ভক্তির শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

(১) কোন ব্যক্তি দুর্দশাপন্ন হ'য়ে অথবা সংসারের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হ'তে পারেন।

(২) অপূর্ণ পার্থিব বাসনার জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হ'তে পারেন ও বাসনা-পূরণের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।

(৩) তিনি জ্ঞানান্বেষক হ'তে পারেন।

এই তিন প্রকার ভক্তির পারে যাবার পর এবং আধ্যাত্মিক সদসদ্-বিচারের ক্ষমতালাভের পর এই পরাভক্তি লাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ধন, ভগবৎ-প্রেম ব্যতীত অন্য সব কিছু অসার—এটা হৃদয়ঙ্গম হ'লে তিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হন। (প্রথম সূত্র দ্রষ্টব্য)

অপর দৃষ্টিকোণ থেকে, এই তিন প্রকার ভক্তির নিম্নরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে : (১) সাত্ত্বিক ভক্তি, (২) রাজসিক ভক্তি (৩) তামসিক ভক্তি।

পরাভক্তিলাভের জন্য প্রয়োজন, সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন গুণ অতিক্রম করা। (৫৬ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন কিভাবে এই তিন গুণ অতিক্রম ক'রে মানব ঈশ্বরের সহিত একত্বে উপনীত হয়। (৪৭ সংখ্যক সূত্র দ্রষ্টব্য)

এই সর্বোচ্চ, অতীন্দ্রিয়, পরমানন্দময় প্রেম ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তা সত্ত্বেও সর্বদেশে সকল ধর্মের অনুগামীকে আমাদের অপ্রতুল মানবিক ভাষা ব্যবহার ক'রে সেই ঐশ্বরিক প্রেমকে প্রকাশ করতে হয়েছে। বস্তুতঃ, ঋষিগণ এই অনির্বচনীয় ঐশ্বরিক প্রেম বর্ণনা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মানবীয় প্রেম প্রকাশক ভাষাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আমরা দেখতে পাই, ভগবৎপ্রেম উপলব্ধির জন্য মানবীয় প্রেমের যতগুলি বিভিন্ন আদর্শ আছে, সে-সকল পথে ভগবৎ-প্রেমিক ভগবৎপ্রেম উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন।

ঈশ্বরসম্পর্কে পাঁচ প্রকার প্রেম আছে। প্রথমটিকে বলে শান্ত। এটা আরম্ভ মাত্র। এ-প্রেমে এখনো সেই প্রেমের আগুন, প্রেমের মত্ততা, সেই তীব্রতা ও ভগবান্‌লাভের আকাঙ্ক্ষা। ভক্ত এখনও ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্ মনে ক'রে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁর মনোভাব স্থির, নম্র ও প্রশান্ত।

দ্বিতীয়, দাস্য; ভক্ত নিজকে মনে করেন যে, তিনি ঈশ্বরের সেবক, তাঁর সন্তান, তাঁর একান্ত আপন জন। খ্রীষ্টধর্মে আমরা দেখি, অধিকাংশ ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে এই সম্পর্ক পাতিয়ে সাধনা করেন। এ ঈশ্বরের পিতৃত্বের ও ভক্তের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ।

নারদের মতে, এই সম্পর্ক আমাদের ঈশ্বরের অধিকতর নিকটস্থ করে ও আমাদের তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টতাসূত্রে আবদ্ধ করে। তখন আর আমাদের মনে হয় না যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ এবং আমরা তখন তাঁর মহত্ত্ব বা গৌরবের কথাও চিন্তা করি না। আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর প্রেমময় ও প্রিয়, এমন কি আমাদের পিতা অপেক্ষা বেশী প্রেমময় ও প্রিয়।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সুপ্রসিদ্ধ প্রার্থনায় প্রভুকে 'প্রিয়তম' ব'লে সম্বোধন করেছেন: "হে প্রিয়তম, তোমার দাস ভয়ংকর সংসারসাগরে নিমজ্জিত! কৃপা ক'রে তাকে তোমার চরণতলের রেণু ব'লে মনে কর।"

তৃতীয়, সখ্য ; "তুমি আমাদের প্রিয় সখা।" বৃন্দাবনের রাখাল বালকগণ এই সম্পর্কের উদাহরণ। কৃষ্ণ তাদের প্রিয় সখা। তারা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করে, নাচে।

লোকে বন্ধুর নিকট হৃদয়দ্বার খুলে দেয়। বন্ধু তাকে তার দোষের জন্য তিরস্কার করে না বরং সর্বদা সাহায্য করতে চায়। সখারা সকলে পরস্পর সমকক্ষ এবং ভক্ত ও তাঁর সখা ভগবান্ পরস্পরের মধ্যে সমান ভালবাসার আদান-প্রদান করেন। ভগবান্ আমাদের সখা, তাঁর কাছে আমরা আমাদের হৃদয়ের গোপন কথাও প্রকাশ করতে পারি। আমরা দেখি যে, তিনি আমাদের নিত্যসাথী।

সেণ্ট জনের সুসমাচারে আমরা পাঠ করি, "আমার আদেশ মতো যদি তোমরা কাজ কর, তাহ'লে তোমরা আমার সখা।"

"এর পর তোমাদের আর দাস বলে ডাকব না, কারণ দাস জানে না তার প্রভু কি করছেন : কিন্তু তোমাদের ডাকব সখা ব'লে ; কারণ আমার পিতার কাছে যা শুনেছি, সবই তোমাদের জানিয়েছি।"

প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্যরত ব্রজের রাখালরূপে আমার গুরুদেব 'মহারাজ'কে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জীবনের শেষমুহূর্তপর্যন্ত মহারাজ নিজে এ-বিষয় অবগত ছিলেন না। তিরোধানের অব্যবহিত পূর্বে দিব্যদৃষ্টিসহায়ে তা জানতে পেরে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আহা-হা ব্রহ্মসমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ।"

দিব্যদর্শনের কথা বলবার সময় তাঁর গলা শুকিয়ে গেল। একজন শিষ্য বললেন, "মহারাজ, এই জলটুকু খান।"

মহারাজ ধীরে ধীরে বললেন, "মন যে ব্রহ্মলোক থেকে নামতে চায় না। ব্রহ্মে ব্রহ্ম ঢেলে দে।" তিনি শিশুর মতো মুখ ফাঁক করলেন, তাঁর মুখে জল ঢেলে দেওয়া হ'ল।

তারপর তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দের দিকে ফিরে বললেন, "ভাই শরৎ, ঠাকুর সত্য, তাঁর লীলাও সত্য।"

এরপর মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন; তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হ'ল এক অপরূপ মধুরিমা। উপস্থিত সকল লোকের মন এমন এক উচ্চভূমিতে উত্থিত হ'ল, যেখানে কোন শোক নেই—আছে শুধু আনন্দ ও নিস্তব্ধ প্রশান্তি। পার্থিব জগৎ ও মৃত্যুর অনুভূতি লয় পেল।

সেই নিস্তব্ধতার ভিতর সহসা মহারাজের সুধামাখা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "এই যে—পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটি চাই। আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে আমায় নূপুর পরিয়ে দে—আমি কৃষ্ণের হাত ধ'রে নাচব।· ·কৃষ্ণ এসেছ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস্ না? তোদের চোখ নেই? আহা-হা, কি সুন্দর! আমার কৃষ্ণ, কমলে কৃষ্ণ—নিত্য কৃষ্ণ, আমার প্রিয়তম।

"এবারের খেলা শেষ হ'ল। দেখ, দেখ—একটি কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে—আর বলছে, আয় চলে আয়! আমি যাচ্ছি।"

মহারাজের নিকট কৃষ্ণ ছিলেন নিত্যসাথী ও সখা।

বাৎসল্য চতুর্থ প্রকার প্রেম। এই প্রেমে ভক্ত ভগবান্‌কে সন্তানরূপে ভালবাসেন। নিজেকে ঈশ্বরের পিতা বা মাতা মনে করলে আমরা তাঁর শক্তির কথা ভুলে যাই; ভুলে যাই শ্রদ্ধা, সম্মান ও বাধ্যতার মনোভাব—যেগুলি তাঁর নিকট থেকে আমাদিগকে দূরে সরিয়ে রাখে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, মহিমময়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ইত্যাদি—এভাবে ভগবদ্‌ভক্ত ঈশ্বরকে ভাবতে চান না। তিনি ভগবান্‌কে ভালবাসতে চান; কারণ তিনি যে তাঁর প্রিয়তম। অবশ্য এ-সম্পর্ক সম্ভব শুধু তাঁদেরই পক্ষে, যাঁরা অবতারে বিশ্বাস করেন; হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই বিশ্বাস দেখা যায়।

অনেক হিন্দু কৃষ্ণকে বালগোপাল মনে ক'রে ভালবাসেন এবং খ্রীষ্টান খ্রীষ্টকে শিশু যীশু ভাবতে পছন্দ করেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শিশুকৃষ্ণ ও যশোদার এই সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে :

কৃষ্ণ তখন ছোট শিশু ; কয়েকজন বালক দেখতে পেল যে, তিনি মাটি খাচ্ছেন। এ-কথা শুনে মাতা যশোদা শিশুকে মুখ ফাঁক করতে বললেন। কৃষ্ণ তাঁর ছোট মুখটি খুললে, বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! শিশু-কৃষ্ণের মুখের ভিতর যশোদা দেখলেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—স্বর্গ, মর্ত্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, চন্দ্র এবং আরও কত কী ; মুহূর্তমাত্র যশোদা বিহ্বল হলেন, ভাবলেন, "এ কি স্বপ্ন না মায়া! আমার ছোট শিশু স্বয়ং ভগবান্—এ দর্শন কি সত্য?" শীঘ্রই তিনি ভাব সংবরণ করলেন ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন :

"হে প্রভু, তুমি আমাদের এই মায়ার সংসারে এনেছ, তুমি আমাকে এই ভাব ও বুদ্ধি দিয়েছ যে, আমি যশোদা, নন্দের রানী, কৃষ্ণের মাতা। তুমি সর্বদা আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ কর।"

শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে যশোদা দেখলেন যে, শিশু হাসছে। তাকে বুকে তুলে চুমো খেলেন। বেদে যিনি ব্রহ্মরূপে, যোগীর ধ্যানে যিনি সর্বব্যাপী আত্মারূপে ও ভক্তদের নিকট যিনি প্রেমময় ভগবান্‌রূপে পূজিত হন, সেই কৃষ্ণকে তিনি তাঁর ছোট শিশু কৃষ্ণরূপে দেখতে পেলেন এবং যখনই তিনি ঐ শিশুর মুখের দিকে তাকাতেন তখনই তাঁর হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে ও সুখে পূর্ণ হ'য়ে যেত।

যুগ যুগ ধ'রে ভারতের বহু নারী নিজেকে কৃষ্ণের মাতা ব'লে মনে করেছেন। 'গোপালের মা' নামে সুপরিচিতা শ্রীরামকৃষ্ণের এক শিষ্যা বর্তমান যুগের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামীজীর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা (মারগারেট নোব্‌ল্‌) গোপালের মার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন।

গোপালের মার ঈশ্বরকে গোপাল-রূপে দর্শনপ্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন :

"গোপালের মা বৃদ্ধা রমণী। পনের-কুড়ি বছর আগেও তিনি বৃদ্ধা ছিলেন ; সেইসময় একদিন দুপুরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত কামারহাটি গ্রামের এক মন্দির এলাকার অন্তর্গত নিজ আবাসকক্ষ থেকে তিনি হেঁটে হেঁটে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে এলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন, যেন তাঁরই আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। গোপালের মা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে দেখতে পেলেন বহু বর্ষব্যাপী আরাধিত নিজ ইষ্টদেব গোপালকে, শিশুকৃষ্ণকে। এই দর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণকে সত্যই তিনি গোপাল ভাবতেন। তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কতবছর কেটেছে, কিন্তু গোপালের মা ঠাকুরকে কখনও প্রণাম করেন নি ; ঠাকুরও তাঁকে 'মা' ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলতেন, 'আমার বৌমা' ; তা'ছাড়া তাঁকে অন্য কিছু বলতে কখনও শুনিনি।"

দিব্যপ্রেমের আর একটি মানবীয় ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, তার নাম মধুর ; এ ভাবে প্রভুই প্রিয়তম। এ জগতে প্রেমের সর্বোত্তম প্রকাশের উপর এই ভাব প্রতিষ্ঠিত ও মানবজাতির জানা প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধন। এই মধুর দিব্যপ্রেমে ঈশ্বরই আমাদের স্বামী। আমরা সবাই রমণী। একটি মাত্র পুরুষ আছেন এবং তিনি হলেন আমাদের প্রিয়তম 'তিনি'।

সাধিকা মীরাবাঈ-এর একটি গল্প আছে। তিনি কৃষ্ণকে স্বামী ভেবে ভালবাসতেন। তিনি রাণী ছিলেন। এক রাজার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ; কিন্তু তিনি স্বামী ও রাজত্ব ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। সেই সময় বৃন্দাবনে বাস করতেন আর একজন সাধু, শ্রীচৈতন্যদেবের একজন শিষ্য। মীরাবাঈ-এর এই সাধুকে দর্শন করবার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু

ঐ সাধু তা প্রথমে অস্বীকার করলেন এই ব'লে যে, তিনি কোন রমণীর সঙ্গে দেখা করেন না। প্রত্যুত্তরে মীরাবাঈ ব'লে পাঠালেন যে, তাঁর দয়িত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অপর কোন পুরুষ বৃন্দাবনে আছেন—এ-কথা তাঁর জানা ছিল না। এ-কথা শুনে সেই সাধু মীরাবাঈ-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে এলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের প্রেম এই মধুরসম্পর্কের সুপরিচিত উদাহরণ। গোপীদের কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন :

"প্রেমের উন্মত্ততা তোমাদের মস্তিষ্কে এলে, ভাগ্যবতী গোপীগণকে চিনতে পারলে, বুঝতে পারবে প্রেম কি বস্তু। যখন জগৎ-সংসার অদৃশ্য হয়, যখন অন্যসব চিন্তা লোপ পায়, যখন তোমার হৃদয় পবিত্র হয়, আর অন্য কোন লক্ষ্য থাকে না, এমন কি জ্ঞানান্বেষণও থাকে না, তখন, কেবলমাত্র তখনই তোমার ভিতর আসে ঐ অসীম প্রেমের শক্তি ও প্রভাব, যে প্রেম ছিল গোপীদের—সেই প্রেমের জন্য প্রেম। এই প্রেমই লক্ষ্য। যখন তুমি এই প্রেম পাও, তখন তুমি সবই পেয়েছ।"

এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে যৌন-সম্ভোগের আনন্দই চরম অভিজ্ঞতা ব'লে বিবেচিত হয়, তবু এ আনন্দ তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী। দয়িতরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসলে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ এত গভীর যে, তা যেন দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে মিলনানন্দের মতো। এ আনন্দ শাশ্বত ও অসীম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল :

'এ কি ভাবা লেগেছে? চারদিকেই তোমাকে দেখছি! কৃষ্ণ হে! দীনবন্ধু, প্রাণবল্লভ! গোবিন্দ!"

"'প্রাণবল্লভ' 'গোবিন্দ' বলতে বলতে আবার সমাধিস্থ হলেন।'

পৃথিবীর অন্যান্য অতীন্দ্রিয়বাদিগণও দয়িতের সহিত একত্ব উপলব্ধি করেছেন। প্লটিনাসের কথায় : "শারীরিক নিদ্রা থেকে জাগরিত হ'য়ে

যখন আমার নিজেকে চিনবার মতো অবস্থা হয়, তখন আমি প্রায়ই বাহ্যজগতের বাইরে গিয়ে ধ্যানের আশ্রয় গ্রহণ করি। তখন আমি এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য দেখতে পাই; তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, আমি এক উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর জগতের লোক, তথাপি আমি আমার ভিতর মহিমময় জীবনের বিকাশ করি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে এক হ'য়ে যাই। এইভাবে আমি এমন এক জীবনীশক্তি লাভ করি যে, এই বোধগম্য জগতের ঊর্ধ্বে উত্থিত হই। আমার যদি এরূপ হয়, তাহ'লে যে সৌন্দর্য নিজেই সকল প্রকার পবিত্রতার আধার, যার দেহধারী আকৃতি নেই, যা দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত, সেই অবিমিশ্র সৌন্দর্য যাঁরা দর্শন করেন, তাঁদের উপলব্ধি কী হয়! এটাই দেবতাগণের এবং দিব্য ও সুখী লোকের জীবন, যাবতীয় উদ্বেগ-মুক্ত; এ-জীবন মানবীয় সুখ-সঙ্গ-হীন, এখানে আছে একাকীর নিকট একাকীর গমন!"

'সঙ্ অব্ সলোমন'-এ দিব্যপ্রেমের মধুর সম্বন্ধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে:

"ওগো আমার প্রিয়তমের মধু-ঝরা মুখটি আমাকে চুম্বন করতে দাও। তার প্রেম সুরার চেয়ে সুধামাখা।

"ওগো প্রিয়তম, তোমার অঙ্গরাগ সৌরভে ভরপুর তোমার নাম দিব্যগন্ধে ভরা। ঐ জন্যই তো প্রেমিকেরা তোমার প্রেমে মশ্‌গুল।"

সেণ্ট জন অব্ দ্য ক্রসের 'দ্য ডার্ক নাইট' শীর্ষক কবিতায় আমরা পাঠ করি, কিভাবে প্রেমিককে আনা হয়েছিল তার প্রেমাস্পদের নিকটে, ও কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল অতীন্দ্রিয় বিবাহ:

"আমার পুষ্পময় বক্ষে
কেবল তারই স্থান, তিনি ছাড়া আর কেউ নয়,
সেইখানেই আমি দিয়েছিলাম
আমার প্রেমাস্পদকে মধুর বিশ্রাম।"

জন দ্য ব্যাপ্টিষ্ট যখন খ্রীষ্টের কথা বলেছিলেন, তখন কি এই সম্বন্ধের কথা তাঁর মনে হয়েছিল ?—

"যার বধূ আছে তিনিই বর : কিন্তু বরের বন্ধু, যিনি দাঁড়িয়ে থেকে বরের কথা শুনছেন, বরের কণ্ঠস্বরের জন্য তিনি আনন্দ বোধ করছেন : আমার আনন্দ পরিপূর্ণ হ'ল।"

দিব্যপ্রেমের বিভিন্ন দিক মানবীয় ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে ভগবৎ-প্রেমের উদয় যে-কোনরূপেই হোক, সে-প্রেম এত বেশী অভিভূত করে, এত বেশী তার গভীরতা যে, ভক্ত সংসার ও পার্থিব বন্ধন সব ভুলে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের কথায় :

"এ জগতে যে বিভিন্নপ্রকার প্রেম আমরা দেখি এবং যেগুলিকে নিয়ে আমরা শুধু অল্প-বিস্তর খেলা করি, সে-সব প্রেমের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মানুষ সেই অসীম সাগরকে জানে না, যে-সাগরে অবিরত এসে মিশছে প্রেমের বেগবতী নদী ; তাই সে মূর্খের মতো মানুষরূপী ছোট পুতুলের দিকে তার প্রেমকে চালিত করে। মানব-প্রকৃতিতে শিশুর প্রতি যে প্রচণ্ড প্রেম আছে সে-প্রেম শিশুরূপী পুতুলের জন্য নয় ; অন্ধের মতো একচেটিয়াভাবে সমস্ত প্রেম যদি শিশুকে দাও, তার ফলে তুমি দুঃখই পাবে। কিন্তু এই দুঃখের মাধ্যমে আসবে জাগরণ, যার দ্বারা তুমি নিশ্চিত জানবে যে, তোমার ভিতর যে-প্রেম রয়েছে, সে-প্রেম যদি মানুষকে দাও, তাহ'লে তার ফলস্বরূপ শীঘ্র বা দেরীতে পাবে দুঃখ ও যন্ত্রণা। অতএব, আমাদের প্রেম দিতে হবে সর্বোচ্চ সত্তাকে, যাঁর মরণ নেই, পরিবর্তন নেই, যাঁর প্রেমের সাগরে জোয়ার নেই, ভাঁটাও নেই। প্রেমকে পৌঁছাতে হবে তার আসল লক্ষ্যে, তাকে যেতে হবে তাঁর নিকট, যিনি প্রকৃতই প্রেমের সাগর। সকল নদী এসে মেশে সাগরে। একবিন্দু জল পাহাড়ের পাশ দিয়ে

এসে যখন নদীতে পড়ে, নদী যত বড়ই হোক না, জলবিন্দুর গতি রুদ্ধ হয় না। সে যে-ভাবেই হোক খুঁজে পায় সাগরে যাবার পথ। আমাদের সকল রিপুর ও সকল আবেগের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্।"

'ক্লাউড অব্ আননোয়িং'-এর গ্রন্থকার সত্যই বলেছেন :

"প্রেমের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় ও ধ'রে রাখা যায়, কিন্তু চিন্তাদ্বারা কখনও নয়।"

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত, যাঁহারা ভগবান্‌কে ঐকান্তিকভাবে ভালবাসেন এবং তাঁহাদের ভালবাসা হয় একমাত্র ভালবাসার জন্যই ভালবাসা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য উদ্ধবকে বলছেন :

"যে-ব্যক্তি আমাতে আনন্দ পান, যিনি সংযত ও স্থিরচিত্ত, যাঁর হৃদয়ে আমাকে ছাড়া আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, তাঁর নিকট সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দপূর্ণ। যে-ভক্ত আমাতে আত্মসমর্পণ করেন এবং যিনি আমাতে আনন্দ পান, তাঁর নিকট ব্রহ্মপদ বা ইন্দ্রপদ, সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব বা অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ তুচ্ছ হয়।"[১]

বস্তুতঃ এই প্রেমই অতীন্দ্রিয় প্রেম! বাইবেলের 'প্রথম অনুজ্ঞা'তেও এটি বর্ণনা করা হয়েছে : "তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে এবং তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বরকে, তোমার প্রভুকে ভালবাসো।"

প্রেমের সহিত সকল চিন্তা ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে, হৃদয়ে তীব্র ইচ্ছা নিয়ে দিবারাত্রি তাঁকে, শুধু তাঁকেই পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে যদি কোন

১ শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১৪।১১-২৩

ব্যক্তি এই সকল সম্বন্ধের যে-কোন একটি সম্বন্ধ ঈশ্বরের সহিত স্থাপন করেন, তাহ'লে তিনি শীঘ্র ভগবৎকৃপা লাভ করেন ও মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের অফুরন্ত ভালবাসা উপলব্ধি করেন। তখন তিনি শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে গণ্য হ'তে পারেন।

প্রভু সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। তাহ'লে কে ভক্ত? যিনি সমগ্র অন্তঃকরণ, হৃদয় ও মন দিয়ে প্রভুতে বাস করেন। এরূপ ভক্ত শুধু যে নিজ হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করেন ও তাঁর সহিত একত্ব অনুভব করেন তাই নয়, তিনি সকলের হৃদয়ে সেই একই প্রভুকে দর্শন করেন, সকলের সহিত প্রভুর একত্ব জেনে মানবজাতির সেবার মাধ্যমে ভগবৎ-সেবা করেন। "তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসো",[১] কারণ তোমার প্রতিবেশী যে তোমার আত্মা।

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং
লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ ॥ ৬৮ ॥

ভক্ত যখন ঈশ্বরের কথা বলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়, অশ্রুপাত হয়, উল্লাসে রোমাঞ্চ হয়। এইরূপ ভক্ত শুধু যে তাঁহার বংশকে পবিত্র করেন, তাহা নহে, তাঁহার জন্মভূমিকে, পৃথিবীকেও পবিত্র করেন।

সেণ্ট ম্যাথুর সুসমাচারে আমরা পাঠ করি, "যেখানে দু'-তিন জন আমার নাম নিয়ে একত্র হন, সেখানে তাঁদের মধ্যে আমি থাকি।"

মনে কর তুমি এক অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করেছ, যেখানে তোমার দয়িত শায়িত আছেন। তুমি দেওয়াল, আসবাবপত্র, বিছানা স্পর্শ করলে। তুমি জানো যে, এখনও তাঁকে খুঁজে পাওনি। তারপর হঠাৎ

১। Love your neighbour as yourself

স্পর্শ করলে তাঁর পা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তুমি জানতে পারলে ইনিই তিনি। তিনি তোমার সঙ্গে কথা বললেন, তুমি তাঁর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'লে। এইরূপই হয় যখন তোমার প্রথম ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বোধ করতে আরম্ভ কর এবং তোমার হৃদয়ে উদয় হয় এক অনির্বচনীয় দিব্যপ্রেম ও আনন্দ। অবশেষে তুমি তাঁর সহিত একত্ব উপলব্ধি কর। তারপর তাঁর সঙ্গসুখ অবিরত উপভোগ করার জন্য আবার তুমি তাঁর নিকট থেকে নিজেকে পৃথক্ কর। আর খোঁজ কর অন্য ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে আমরা পাঠ করি, শ্রীরামকৃষ্ণ কিরূপ অবিরত মা-কালীদর্শন করতেন; তবু তিনি ভক্তদের সঙ্গ চাইতেন। এবং প্রায়ই বলতেন, "মা গো, একটু দাঁড়া মা! তোর ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করতে দে মা!"

আমার গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন যে, ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বহুবার সমাধিমগ্ন হ'তে দেখেছেন। এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্য। জীবনে একবারও সর্বোচ্চ সমাধিতে মগ্ন হয়েছেন—এমন লোকও দুর্লভ।

ভক্তগণ একসঙ্গে মিলিত হ'লে তাঁরা কিরূপ আনন্দ লাভ করেন, সে বিষয় বলা হয়েছে ভগবদ্‌গীতায়:

"মন ও ইন্দ্রিয় আমাতে নিবিষ্ট ক'রে তাঁরা একমাত্র আমার বিষয় আলোচনা করেন। এইভাবে তাঁরা পরস্পরকে আনন্দ দান করেন এবং তাঁরা পরম আনন্দে ও সন্তোষে কাল যাপন করেন। আমার সঙ্গে নিত্য-যুক্ত থেকে তাঁরা সতত আমার উপাসনা করেন। আমি তাঁদের সম্যগ্‌জ্ঞান দান করি যার ফলে তাঁরা আমাকে লাভ করেন।"[১]

শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভাই লক্ষ্মণকে বললেন, "যেখানে দেখবে কোন ভক্ত

১। গীতা, ১০।৯-১০

আমার নাম নিয়ে নাচে, কাঁদে, জানবে যে, আমি সেখানে প্রকাশিত হই।" ভক্তের হৃদয়মধ্যে উত্থিত দিব্য-আনন্দের জন্য ভক্ত প্রভুর নামে কাঁদে ও নাচে।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর প্রার্থনায় বর্ণনা করেছেন :

"হে প্রভু, সে দিন কবে হবে, যেদিন তোমার নাম কীর্তন করতে করতে আমার দু-নয়নে ধারা বইবে, বাক্য রুদ্ধ হবে ও দেহে পুলকের সঞ্চার হবে।"

সূত-সংহিতায় আমরা পাঠ করি : "যাঁর হৃদয়-মন অসীম সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়, সেই ভক্তের দ্বারা কুল পবিত্র হয়, মাতা ধন্যা হন, পৃথিবী পবিত্র হয়।"

ভক্ত যত বড় হবেন, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবের পরিবেশও তত বিস্তৃত হবে। মহারাজ যেখানে যেতেন, সেখানে তাঁর চতুর্দিকে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। যে কেউ তাঁর নিকটে আসতেন, তিনি পবিত্র ও রূপান্তরিত হতেন। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁর চারিদিকের লোক অনুভব করতেন যেন তাঁরা এক অসীম আনন্দ-উৎসবে যোগদান করেছেন। এইরূপ মহান্ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিমান্ যোগীরাই পৃথিবীর আলোক-স্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য উদ্ধবকে বলেছেন, "যিনি আমাকে ভালবাসেন, তিনি পবিত্র হ'য়ে যান ; তাঁর হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়। তাঁর উচ্চতর আবেগময় প্রকৃতি জাগরিত হওয়ার জন্য তিনি অতীন্দ্রিয়-চেতনাভূমিতে উন্নীত হন। তাঁর চক্ষু থেকে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়, প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়, দেহে রোমাঞ্চ হয়। এই অবস্থায় আনন্দ এত তীব্র হয় যে, নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে ভুলে গিয়ে তিনি কখনও কেবল কাঁদেন, কখনও বা হাসেন, গান করেন বা নাচেন ; এরূপ ভক্ত বিশ্ব-পাবনকারী একটি প্রভাবস্বরূপ।"

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি
সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি ॥ ৬৯ ॥

ভগবদ্‌ভক্ত এইসব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তীর্থসমূহকে পবিত্র করেন, তাঁহাদের কৃতকর্মই সুকর্মের নিদর্শন, তাঁহারা শাস্ত্রকে সৎ-শাস্ত্রে পরিণত করেন (নব সমর্থন দেন)।[১]

প্রত্যেক দেশে মহাপুরুষগণের জন্মস্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হয়। বহু শতাব্দী ধ'রে এইসব স্থানে বহু আধ্যাত্মিক সাধক সাধন-ভজন করেছেন ও জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়েছেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এইসব স্থান দর্শন ক'রে সমাধিমগ্ন হয়েছেন এবং ঈশ্বরের দিব্য-উপলব্ধি লাভ করেছেন। এ-সবের ফলে তাঁরা আরও বেশী গভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন ও স্থানগুলিকে আরও বেশী পবিত্র করেছেন। বর্তমান কালেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে, তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

দাক্ষিণাত্যে মাদুরায় মীনাক্ষী দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত এক বিখ্যাত মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রবেশ ক'রে আমার গুরুদেব মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে, "মা, মা" ব'লে ডাকলেন, তারপরই তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ; তিনি মহারাজের অবস্থা দেখে, যাতে তিনি প'ড়ে না যান, সেজন্য তাঁর বাহু ধ'রে থাকলেন। মহারাজকে ভাবের ঘোরে বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মন্দিরের পুরোহিতগণ ও ভক্তগণ তাঁর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। যাত্রিপূর্ণ মন্দির নিস্তব্ধ। এই অবস্থা প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিল। বাহ্যসংজ্ঞা লাভ ক'রে মহারাজ নীরবে মন্দির ত্যাগ করলেন। পরে তিনি ঐসময় দেবীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তিদর্শনের বিষয় বর্ণনা করেন।

১ 'অর্থাৎ তাহারা যে-সকল শাস্ত্র মানিয়া চলেন সে-সকল সৎ-শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়।'—ভক্তিপ্রসঙ্গ পৃঃ ১৫৪

শিবের নামে উৎসর্গীকৃত রামেশ্বর-মন্দিরে গিয়ে মহারাজ সমাধিমগ্ন হন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে পাবার পরও তিনি বহুক্ষণ ভাবের ঘোরে ছিলেন।

বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে বহুবার তাঁর এইরূপ দিব্যদর্শন হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এক শিষ্য স্বামী সারদানন্দ রোমে সেণ্টপিটারের গীর্জা দর্শন করতে গিয়েছিলেন। গীর্জায় প্রবেশ ক'রে তিনি সমাধিমগ্ন হন। পরে তিনি শুধু বলেছিলেন যে, এইসময় তাঁর দর্শন হয়—সেণ্ট পিটারের গীর্জা প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরী হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একদিন আমাকে তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। তাঁর কথাগুলি আমি লিখে রেখেছি।

"আমি সারনাথ-দর্শনে গিয়েছিলাম। (বারাণসীর নিকট সারনাথ অবস্থিত। জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হ'য়ে বুদ্ধ সারনাথে তাঁর প্রথম বাণী প্রচার করেন)। হঠাৎ আমি বাহ্যজ্ঞান হারালাম; মনে হ'ল, আমার মন প্রায় লয় হ'য়ে গেছে। এক জ্যোতিঃ-সমুদ্রে আমি সম্পূর্ণ মগ্ন হলাম,—সে জ্যোতিঃ শান্তি আনন্দ ও চৈতন্যময়। আমি অনুভব করলাম যেন আমি বুদ্ধের ভিতর বাস করছি। কতক্ষণ আমি এ অবস্থায় ছিলাম, আমার মনে নেই। গাইড ভেবেছিল, আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছি। দেরী হচ্ছে দেখে সে আমাকে জাগাবার চেষ্টা করে এবং এভাবে আমার সাধারণ বাহ্যচেতনা ফিরিয়ে আনে।

"পরে আমি যখন কাশীতে বিশ্বনাথ-দর্শনে গিয়েছিলাম, আমি মনে মনে ভাবলাম, 'কেন আমি এখানে এলাম? পাথরের মূর্তি দেখতে?" তখন আবার সেই একই দর্শন। বিশ্বনাথ যেন আমাকে বলছেন, 'একই জ্যোতিঃ, এখানেও যা, সেখানেও তাই; সত্য এক।"

বৃন্দাবন-দর্শনকালে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা হয়তো কিছু

মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে, যদিও পূর্বোল্লিখিত উচ্চতর উপলব্ধির তুলনায় এর বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই।

আমি ও ভগিনী ললিতা নামে একজন মার্কিন শিষ্যা ট্রেনে বৃন্দাবন গিয়েছিলাম। বৃন্দাবনের আগের স্টেশনে পৌছাবার সময় একটি পবিত্র মন্ত্র আমার হৃদয় ও ওষ্ঠকে অধিকার ক'রল। চেষ্টা না-করা সত্ত্বেও তিন দিন তিনরাত্রি অবিরামভাবে ঐ মন্ত্র জপ করতে লাগলাম—বৃন্দাবনে থাকাকালে আমি এক নিমেষও ঘুমোতে পারিনি। মন্ত্রোচ্চারণের সময় আমি এমন এক মাধুর্য ও আনন্দ উপলব্ধি করেছিলাম, যা পূর্বে কখনও করিনি। ফিরবার পথে আমরা যখন সেই স্টেশনের নিকট এলাম, যেখান থেকে আমি মন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করি, ঠিক সেইস্থানে সেই পবত্রি মন্ত্র আমাকে ছেড়ে চলে গেল ; যেভাবে আমার নিকট হঠাৎ এসেছিল, ঠিক সেইভাবে হঠাৎ ছেড়ে গেল।

আমার গুরুদেব বলতেন, তীর্থস্থানে এক আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবাহিত হয়। সাধক সেখানে সামান্য চেষ্টায় সহজে জ্ঞানালোক লাভ করতে পারে।

যেখানে ধার্মিক ব্যক্তি বাস করেন, যেখানে আধ্যাত্মিক সাধক ঈশ্বর-চিন্তা করেন এবং ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরদর্শনের কামনা করেন, সেখানে পবিত্রতা বিরাজ করে। পবিত্রচিন্তা এবং সৎ ও পবিত্রজীবন যাপনদ্বারা মানুষ শুধু নিজের মঙ্গল করেন না, তাঁরা অপরকে সৎ ও পবিত্র হতে সাহায্য করেন। পবিত্রতা সংক্রামক।

তাঁহাদের কৃতকর্ম সুকর্মের নিদর্শন।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ দৃষ্টান্তস্বরূপ। সর্বভাবে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে। তাঁদের সব আচরণ অনুসরণের চেষ্টা করা উচিত। তাঁদের আচরণই ন্যায়-পথের দিশারী।

অনেকে ভাবতে পারেন, আমরা তো এখনো তাঁদের মতো মহাপুরুষ হয়নি, কাজেই তাঁদের অনুসরণ করতে, তাঁদের আচরণের অনুকরণ করতে পারি না। এ যেন গল্পের সেই বালকটির মতো ভাব,—যে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, সমুদ্রের ঢেউ থামলে, সমুদ্র শান্ত হ'লে তারপর সে স্নান করবে। না, আমাদের যদি হামাগুড়ি দিতে হয়, তবুও তাঁদের অনুসরণ ক'রে চলার চেষ্টা করতে হবে। হয়তো আমরা বহুবার আছাড় খাব, তবু প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়ে আবার মহাপুরুষের পদচিহ্ন অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

তাঁহারা শাস্ত্রকে সৎ-শাস্ত্রে পরিণত করেন।

শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলি প্রামাণিক ব'লে প্রমাণিত হয় তখনই যখন অন্য ব্যক্তি এইসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

তন্ময়া ॥ ৭০ ॥

ভক্তগণের প্রত্যেকেই ঈশ্বরে তন্ময় হন।

তাঁদের মন ও ইচ্ছা ঈশ্বরের মন ও ইচ্ছার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়। 'অহং'-ভাব, যা মায়া বা অজ্ঞানের বন্ধন সৃষ্টি করে, সেই 'অহং'-ভাব থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত হন।

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ
সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১ ॥

এইরূপ ভক্ত পৃথিবীতে বাস করিলে তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ আনন্দিত হন, দেবগণ আনন্দে নৃত্য করেন, পৃথিবী পবিত্র হয়।

আমরা দেখেছি, এই সকল সাধুপুরুষ মানবজাতির পক্ষে ভগবানের বিরাট দানস্বরূপ। তাঁরা তাঁদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশকে পবিত্র করেন। যে-দেশে ও জাতিতে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, সে-দেশ ও জাতিকে এবং পৃথিবীকে পবিত্র করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলা হয়েছে, "বৃক্ষের মূলে জল দিলে শাখা-প্রশাখা-পত্রাদিসহ সমগ্র বৃক্ষটি যেমন পুষ্ট হয়, সেইরূপ প্রভুকে সন্তুষ্ট করলে সর্বজীব সন্তুষ্ট হয়।" কিভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে? তাঁকে ভালবাসো, তাঁকে ভালবাসো।

নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-ক্রিয়াদি-ভেদঃ ॥ ৭২ ॥
যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩ ॥

ভক্তগণের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, কর্ম প্রভৃতির জন্য কোন ভেদ নাই।

যেহেতু ভক্তগণ ঈশ্বরের আপন জন।

ভগবদ্‌ভক্তগণের মধ্যে জাতি বা অনুরূপ বিষয়ে কোন ভেদ নেই; এইসত্য বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁরা নিজেরাই এক পৃথক্‌জাতি। ভগবদ্‌ভক্তগণের দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদি সমভাবে পবিত্র হয়। তাঁদের মধ্যে আর কি পার্থক্য থাকতে পারে?

একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে সন্ন্যাসীদের জাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন; বুদ্ধদেব উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি সন্ন্যাসীদের জাতির কথা জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তাদের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করলে না?" বস্তুতঃ জাতির অহংকার থেকে এই ভ্রান্তির জন্ম। আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ নির্ভর করে সাধকের মানসিক গুণাবলীর উপর; জাতি প্রভৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

নবম পরিচ্ছেদ

নৈতিক ধর্ম ও ভগবৎপূজা

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪ ॥

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ চ ॥ ৭৫ ॥

তর্ক-বিতর্ক অবলম্বন করিবে না।

তর্কের শেষ নাই, সন্তোষজনক কোন ফল তর্কদ্বারা পাওয়া যায় না।

তর্ক-বিতর্কে কিছুই পাবে না! প্রকৃত সাধক যিনি ঈশ্বরকে জানতে চান, তাঁকে ভালবাসতে চান তিনি অসার তর্ক গ্রাহ্য করেন না। তর্ক ঈশ্বরের অস্তিত্বের সত্যতা চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ধর্ম-শাস্ত্রবিদ্‌গণ ও দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেন; কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা তর্কের জন্য এমন যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন যার দ্বারা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে পারেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

ঈশ্বর আছেন, তার একমাত্র প্রমাণ এই যে, তাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

তর্কদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অপরের বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যে-ভাবেই চেষ্টা করা হোক, তাকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করা যায় না।

ঈশ্বরকে জানার ও তাঁকে উপলব্ধি করার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন; যাঁরা পার্থিব জীবনের অসারতা উপলব্ধি করেছেন, তাঁদেরই হৃদয়ে এই ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

কঠ-উপনিষদে লিখিত আছে :

"শাস্ত্র-পাঠদ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, মেধাদ্বারা বা বহু শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যে-সাধক তাঁকে জানবার জন্য প্রার্থনা করেন, তিনি তাঁকে জানতে পারেন—তাঁর নিকটই আত্মা তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।"

"বিদ্যাদ্বারা কেউ তাঁকে জানতে পারেন না, যদি না তিনি অসৎ থেকে বিরত থাকেন, যদি না তিনি ইন্দ্রিয় সংযম করেন, মনকে শান্ত না রাখেন ও ধ্যানাভ্যাস না করেন।"[১]

"ওঠো, জাগো, আচার্যদের সমীপস্থ হ'য়ে অবগত হও। তত্ত্বদর্শিগণ বলেন যে, ক্ষুরের ধারালো অগ্রভাগ যেরূপ দুর্গম, সেই পথও সেইরূপ দুর্গম।"[২]

ঐ উপনিষদে আচার্য তাঁর শিষ্য নচিকেতাকে বলেন :

"যে-জাগরণ তোমার মধ্যে এসেছে, সেটা মেধার মাধ্যমে পাওয়া যায় না, বরং সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায় জ্ঞানী কর্তৃক উপদিষ্ট হ'লে। প্রিয় নচিকেতা, তুমি ধন্য! তুমি ধন্য! কারণ তুমি শাশ্বতকে অন্বেষণ ক'রছ।"[৩]

হৃদয়দ্বার খোলা রেখে বিনয়ের সহিত যদি কেউ কোন ব্রহ্মজ্ঞের সমীপস্থ হন, তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কোন তর্কের প্রয়োজন হয় না। তাঁর উপস্থিতিতেই তিনি অনুভব করবেন যে, তাঁর পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা সম্ভব।

আমাদের মধ্যে যাঁরা আমার গুরুদেবের সমীপস্থ হয়েছেন, তাঁরা এই সত্যকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবেন।

---

১ কঠ ১।২।২৩-২৪
২ কঠ ১।৩।১৪
৩ কঠ ১।২।৯

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদর্থৈক-কর্মাণ্যপি করণীয়ানি ॥ ৭৬ ॥

ভক্তিমূলক শাস্ত্রপাঠের সময় শাস্ত্রীয় উপদেশের উপর ধ্যান কর ও উহা অনুসরণ কর; ইহার ফলে তোমার হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তি বর্ধিত হইবে।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে শাস্ত্রপাঠ প্রয়োজন। নিয়মিত পাঠ করতে হবে। শাস্ত্রীয় উপদেশগুলি ধ্যান ক'রে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর সেই উপদেশমতো কাজ ক'রে চলতে হবে। এইভাবে ভগবানের প্রতি সাধকের ভক্তির গভীরতা বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ একজন খুব পণ্ডিত ও ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। একদিন তাঁর কাছে গিয়ে ভগবদ্‌গীতার পাঠ দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি সম্মত হলেন ও পরদিন আসতে বললেন। তিনি আমাকে বললেন, "আমি তোমাকে একটি মাত্র পাঠ দেবো, সেটিই প্রথম ও সেটিই শেষ।" তিনি আরও বললেন, "গীতার সংস্কৃত সহজে বোঝা যায়। একটি শ্লোক পড়বে, তার অর্থের বিষয় ধ্যান করবে, তার পর কয়েক দিন সেই উপদেশমতো চলবে। তারপর আবার পরবর্তী শ্লোক পড়বে।"

এখন আমি বুঝতে পারছি যে, এটা দু-এক দিনের বিষয় নয়; গীতার একটি মাত্র শ্লোক নিয়ে তার উপদেশমতো যদি কাজ করা যায়, তাহ'লে সাধক নিশ্চয়ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন।

সত্যই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, পৃথিবীর সকল শাস্ত্র যদি নষ্ট হ'য়ে যায়, যীশুখ্রীষ্টের একটি মাত্র বাক্য যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহ'লে তখনও পৃথিবীতে ধর্ম জীবন্ত থাকবে। ঐ বাক্যটি হ'ল, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God."—যাঁদের হৃদয় পবিত্র, তাঁরা ধন্য; কারণ তাঁরা ঈশ্বর-দর্শন করবেন।

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিভ্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে
ক্ষণার্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

সুখ, দুঃখ, বাসনা, লোভ প্রভৃতি হইতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভক্তের একমুহূর্তকালও বৃথা যাইতে দেওয়া বা ঈশ্বর উপাসনার জন্য বিলম্ব করা উচিত নয়।

বাসনা ও বিভিন্ন দ্বন্দ্বাদি থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত যদি সাধক ভগবানের পূজা ও ধ্যান করবার জন্য অপেক্ষা করেন, তাহ'লে সে-সুযোগ কোন দিন আসবে না। হৃদয়ে বাসনার তরঙ্গ ক্রমাগত উত্থিত হবে, সাধককে ঐ সব তরঙ্গ শান্ত করবার চেষ্টা করতে হবে; প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের চিন্তা করা ও তাঁর নিকট প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

জপ ও ধ্যানে শান্তি ও সুখ পাচ্ছেন না ব'লে যদি সাধক ঐ সব অভ্যাস ত্যাগ করেন, তাহ'লে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরের নাম জপ ক'রে ও তাঁর উপস্থিতি অনুভব ক'রে সমগ্র অন্তর দিয়ে তাঁকে স্মরণ-মনন করবার চেষ্টা করতে হবে; ক্রমশঃ মন শান্ত হবে এবং অবশেষে ঈশ্বরে ও তাঁর প্রেমে সাধক আকৃষ্ট হবেন।

ভগবদ্গীতায় আমরা পাঠ করি:

"বুদ্ধিযুক্ত ইচ্ছার সাহায্যে ধৈর্য সহকারে ধীরে ধীরে সকল প্রকার মানসিক চিত্ত-বিক্ষেপ থেকে মুক্ত হ'তে হবে। আত্মাতে মনকে সমাহিত করতে হবে এবং অপর কোন বিষয় কখনও চিন্তা করা চলবে না। চঞ্চল ও অশান্ত মন যেখানেই যাক, তাকে গুটিয়ে আনতে হবে ও তাকে আত্মার বশীভূত করতে হবে।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "প্রথম অবস্থায় সর্বদা ঈশ্বরচিন্তায় মনকে

১ গীতা ৬।২৫

নিযুক্ত রাখা বড় কঠিন; কিন্তু প্রত্যেক বার নূতনভাবে চেষ্টা করতে হবে, এতে শক্তি বৃদ্ধি পাবে।"

আমার গুরুদেব বলতেন, "আধ্যাত্মিক জীবনে চেষ্টা চালিয়ে গেলে কেউ অকৃতকার্য হয় না।"

অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদি-চারিত্র্যাণি পরিপালনীয়ানি ॥ ৭৮ ॥

ভক্তের অহিংসা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, দয়া, বিশ্বাস প্রভৃতি ধর্ম অনুশীলন করা উচিত।

সত্যবাদিতা—কাকেও দুঃখ না দিয়ে কথা বলা, সত্যবাদী হওয়া, সর্বদা প্রিয় ও হিতকথা বলা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ধর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, "সত্য কথা কলির তপস্যা।" সেইসঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা অযাচিত ও অপ্রয়োজনীয় স্পষ্টবাদিতায় অপরের মনে কষ্ট না দিই।

পবিত্রতা—দেহের পবিত্রতাই বাহ্য পবিত্রতা। এটা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। কথায় আছে, "দেবত্বের ঠিক পরেই পরিচ্ছন্নতা।"[১] বাহ্য পরিচ্ছন্নতা অভ্যাস করা সহজ।

কিন্তু বাহ্য পবিত্রতায় আরও বুঝায়, গুরু ও সাধুর প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব, সরলতা ও যৌন পবিত্রতা।

মানসিক পবিত্রতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তকে অনুভব করতে হবে যে, তিনি যখন ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম জপ করছেন, তখন ঈশ্বরের উপস্থিতে স্নান ক'রে নিজে পবিত্র হচ্ছেন। এই মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য নিয়মিত অভ্যাসের প্রয়োজন।

১ Cleanliness is next to godliness

মানসিক পবিত্রতায় আরও বুঝায়, স্থৈর্য, দয়াভাব, ধ্যান ও উদ্দেশ্যের সাধুতার অভ্যাস। শঙ্করাচার্য ঘোষণা করেছেন যে, ইন্দ্রিয়বিষয়ক বস্তু-সমূহের মধ্যে বাস করেও ঐ সব বস্তুর প্রতি আসক্তি বা বিতৃষ্ণা থেকে মুক্তিকে মানসিক পবিত্রতা বলে।

দয়া—"অপরের সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর, যে-রূপ ব্যবহার তুমি তার নিকট থেকে প্রত্যাশা কর।"[১]

আমার গুরুদেব আমাকে এই সত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, "ধ্যান কর্, ধ্যান কর্, ধ্যান কর্। তারপর ঈশ্বরের আনন্দ যখন নিজের ভিতর উপলব্ধি করবি, তখন তোর হৃদয় অপরের প্রতি সহানুভূতি ও দয়ায় বিগলিত হবে। বুঝতে পারবি, তারা অনর্থক কষ্ট পায় কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে আনন্দের খনি।"

বিশ্বাস—শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। সেইসঙ্গে প্রয়োজন আত্ম-বিশ্বাস। বলতে হবে, 'অপরে ঈশ্বরদর্শন করেছেন, আমিও তাঁকে লাভ ক'রব।'

অনুরূপ অন্যান্য ধর্ম বা সাধনা—

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই ধর্ম বা সাধনাগুলি বর্ণনা করেছেন :

"অতএব আমি তোমাকে বলছি, নম্র হও, নির্দোষ হও, মিথ্যা ভান কোরো না, সৎ হও, ধৈর্যশীল হও, গুরুসেবা কর, দেহ ও মনকে শুচি কর, সুস্থির হও, স্থির সংকল্প কর, অভিমান জয় কর, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত হও, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও-বার্ধক্যের দুঃখসম্পর্কে সম্যগ্‌ভাবে অবহিত হও, বিষয়ে অনাসক্ত হও, আমাতে অচলা ভক্তি রাখো···আত্মজ্ঞানলাভের জন্য অবিরাম কঠোরভাবে চেষ্টা কর। এগুলি আত্মজ্ঞানের সাধনা ব'লে কথিত। এগুলির যা বিপরীত তা অজ্ঞান মাত্র।"[২]

১ "Do unto others as you would have them do unto you.'

২ গীতা ১৩।৮-১২

সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

সকল প্রকারে চিত্তবিক্ষেপকর চিন্তারহিত হইয়া দিবারাত্র একমাত্র ভগবানের ভজনা করা কর্তব্য।

আধ্যাত্মিক সাধনার অভ্যাসদ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায়। এই অবস্থায় সতত ঈশ্বরের স্মরণ-মনন হয়—ভক্তের প্রেমের চিন্তাস্রোত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয় ঈশ্বরের দিকে। বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক কর্মের মধ্যে তখন আর কোন পার্থক্য থাকে না। "প্রতি কর্মে যিনি ব্রহ্ম-দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্ম-লাভ করেন।" তাঁর সমগ্র জীবন ঈশ্বরে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, তাঁর হৃদয়ের ভগবদ্‌ভক্তি তাঁকে প্রতি কর্মে প্রেরণা দিয়েছে। সকল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন।

স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি
অনুভাবয়তি চ তক্তান্ ॥ ৮০ ॥

যেখানে এইভাবে ভগবানের উপাসনা করা হয় সেখানে অতি শীঘ্র ভক্তগণের মানসপটে তিনি প্রকাশিত হন।

এর নাম সমাধি। এ অবস্থায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উন্মীলিত হয়, ভক্ত নিজের ভিতর ও সকলের ভিতর ঈশ্বরদর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দে বাস করেন ও ইহজন্মেই মোক্ষলাভ করেন।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥

শাশ্বতসত্যের প্রতি ভক্তি অবশ্যই শ্রেষ্ঠভক্তি।

এই পরাভক্তিই আবার পরমজ্ঞান।

গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি-দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্তি-আত্মনিবেদনাসক্তি-তন্ময়াসক্তি পরমবিরহাসক্তি রূপা একধা অপি একাদশধা ভবতি ॥ ৮২ ॥

এই দিব্যপ্রেম একাদশটি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় :

(১) ভক্ত ভগবানের নামগুণগান ও কীর্তন করিতে ভালবাসেন।

(২) তিনি তাঁহার অতি মনোরম সৌন্দর্য ভালবাসেন।

(৩) তিনি তাঁহাকে তাঁহার হৃদয়ের পূজা নিবেদন করিতে ভালবাসেন।

(৪) তিনি তাহার উপস্থিতি অবিরাম ধ্যান করিতে ভালবাসেন।

(৫) তিনি ভগবানের দাস—এই চিন্তা করিতে ভালবাসেন।

(৬) তিনি তাঁহাকে সখারূপে ভালবাসেন।

(৭) তিনি তাঁহাকে সন্তানরূপে ভালবাসেন।

(৮) তিনি তাঁহাকে দয়িত বা প্রিয়তম কান্তরূপে ভালবাসেন।

(৯) তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ শরণাগত হইতে ভালবাসেন।

(১০) তিনি তাঁহার ভিতর সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইতে ভালবাসেন।

(১১) তিনি তাঁহার বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে ভালবাসেন।

যারা ভগবানকে দয়িতরূপে ভালবাসেন, তাঁদের জীবনে প্রেমের এই শেষোক্ত প্রকাশ, "তাঁর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করা", আদর্শ স্বরূপ হয়। যখন এই বিরহযন্ত্রণা অনুভব করা যায়, প্রেমাস্পদের সহিত মিলনে আরও বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-হনুমদ্‌বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্দত্তে
স ভক্তিমান্ ভবতি সঃ প্রেষ্ঠং লভতে
সঃ প্রেষ্ঠং লভত ইতি ॥ ৮৪ ॥

ভক্তি-সাধনার আচার্যগণ একমত হইয়া লোকমত গ্রাহ্য না করিয়া এই প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। সেইসকল মহান্ আচার্যের নাম: কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান, বিভীষণ এবং আরও অনেকে।

যিনি নারদ-বর্ণিত মঙ্গলদায়ক দিব্যপ্রেম বিশ্বাস করেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে এই সকল উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তিনি ভগবৎপ্রেমিক হন, পরমসুখ লাভ করেন এবং জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হন।

এইসকল উপদেশে বিশ্বাস স্থাপন করার অর্থ এই যে, এইসকল উপদেশ নিজ জীবনে অনুশীলন করা।

এই গ্রন্থের উপসংহাররূপে স্বামী বিবেকানন্দের ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে দুইজন মার্কিন ভক্তকে লিখিত পত্রের উদ্ধৃতিটি দেওয়ার চেয়ে ভাল আর কিছু আমার মনে পড়ছে না। ভক্তিযোগের মাধুর্যের এটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

"ক্ষীণ ক্ষণিক আলোককে প্রতিদিন ধর—সেই অসীম সৌন্দর্য, শান্তি ও পবিত্রতাপূর্ণ জগতের আলোক—আধ্যাত্মিক আলোক—তার মধ্যে ডুবে থাকো। অচ্ছিন্ন-সূত্রের মতো তোমার আত্মা দিনরাত উঠুক প্রেমাস্পদের পদতলে, যাঁর সিংহাসন পাতা আছে তোমার হৃদয়ে, বাদবাকী—তোমার দেহ ইত্যাদি—যা খুশি করুক। জীবন ক্ষণস্থায়ী, দ্রুতসঞ্চারী স্বপ্নবৎ,

রূপ যৌবন ম্লান হয়। বলো দিনরাত, 'তুমি আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্বামী, আমার প্রিয়, আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর—আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু চাই না—কিছুই না, শুধু তোমাকে চাই, তুমি যে আমাতে রয়েছ, আমি যে তোমাতে। ধন যায়, রূপ বিনষ্ট হয়, জীবন গত হয়, শক্তি পলায়ন করে, কিন্তু চিরকাল থাকেন প্রভু, চিরকাল চিরকাল থাকে প্রেম। দেহযন্ত্রকে পরিপাটি রাখায় যদি গৌরব থাকে, আরও গৌরবজনক, দেহের সঙ্গে আত্মাকে যন্ত্রণা ভোগ করতে না দিয়ে তাকে দেহাত্মবোধের ঊর্ধ্বে রাখা—জড়কে আত্মা থেকে পৃথক করে রাখা—তুমি যে জড় নও তার একমাত্র ব্যবহারিক নিদর্শন।

"ঈশ্বরকে আঁকড়ে থাকো, দেহের আর কোন বস্তুর কি হ'ল, কে গ্রাহ্য করে? বিপদের প্রচণ্ড ভীতির মধ্যে বলো—'আমার ঈশ্বর আমার প্রিয়'। মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতর বলো, 'আমার ঈশ্বর আমার প্রিয়।' সূর্যের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীতে সকল অমঙ্গলের মাঝে বলো, 'আমার ঈশ্বর আমার প্রিয়। তুমি এখানে রয়েছ, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে আছ, আমি তোমাকে অনুভব করছি। আমি তোমার, আমাকে গ্রহণ কর। আমি এ জগতের নই, শুধু তোমার, আমাকে ত্যাগ কোরো না।' হীরার খনি ছেড়ে কাচের মালার পিছনে যেও না। জীবনটাই তো বড় সুযোগ। এ সংসারে কী সুখ খুঁজে বেড়াও?—তিনি যে আনন্দের উৎস। সর্বোচ্চকে অন্বেষণ কর, সর্বোচ্চ তোমার লক্ষ্য হোক্ এবং তুমি নিশ্চয়ই পাবে সেই সর্বোচ্চকে।"

॥ হরি ওম্ তৎ সৎ